নিশীথ নিঝুম

বারীন্দ্রনাথ দাশ

দি বুক ক্লাব প্রাইভেট লিমিটেড
৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা ৭

প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৬৭

প্রকাশক
ডি. পি. বসু
দি বুক ক্লাব প্রাইভেট লিমিটেড
৩৪ রিপণ স্ট্রীট কলিকাতা ১৬

মুদ্রাকর
শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল
ক্যালকাটা ওরিয়েণ্টাল প্রেস প্রাঃ লিঃ
৯ পঞ্চানন ঘোষ লেন কলিকাতা ৯

প্রচ্ছদ
অরুণ বণিক

প্রচ্ছদ ব্লক
ব্লকম্যান (প্রোসেস)
প্রচ্ছদ মুদ্রক
ফটোটাইপ সিণ্ডিকেট

বাঁধাই
এশিয়াটিক বাইণ্ডিং ওয়ার্কস

প্রকাশনা বিভাগের
মূল উপদেষ্টা
জ্যোতিপ্রসাদ বসু

দাম তিন টাকা

ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত

প্রিয়বরেষু

এই কাহিনীর সমস্ত চরিত্র এবং ঘটনা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। কোথাও কোনো ব্যক্তির বা কোনো ঘটনার সঙ্গে কোনো মিল সম্পূর্ণ আকস্মিক এবং অনিচ্ছাকৃত।

রচনাকাল :

নভেম্বর ১৯৫২—জানুয়ারি ১৯৫৫

লেখকের অন্যান্য বই :

কর্ণফুলি
রঙের বিবি
বেগমবাহার লেন
অনুরঞ্জিতা
পূর্বরাগের ইতিহাস
অন্তরতমা
বিশাখার জন্মদিন
চায়না টাউন
রাজা ও মালিনী
মিতালি-মধুর
দুলারীবাঈ

মনোবিজ্ঞানের বিখ্যাত অধ্যাপক ডক্টর অসিত চ্যাটার্জীর বইগুলোর জনপ্রিয়তা খুব। নানারকম অবিশ্বাস্য অসম্ভব ঘটনা সে-সব বইতে লিপিবদ্ধ করেছে অসিত চ্যাটার্জী, যার সন্ধান পাওয়া গেছে বিভিন্ন গবেষণায় মানুষের অবচেতন মনের খোঁজখবর নিতে গিয়ে। সে সব পড়তে ভালোবাসে সবাই, কিন্তু পড়ে স্তম্ভিত হয়, শঙ্কিত হয়, জিজ্ঞেস করে—এ কি সম্ভব? অসিত চ্যাটার্জী বলে, সম্ভব হয়তো নয় কিন্তু ঘটেছে। তার মতে, সত্যিকারের অসম্ভব এবং অবিশ্বাস্য ঘটনা নাকি সবই বাস্তব জীবনেই ঘটে, যা অনেক ক্ষেত্রে কেউ কাউকে বলে না, কারণ আজকের সভ্যসমাজের মানুষের সচেতন মন একটা তথাকথিত যুক্তিবাদের মুখোশ পরে থাকে সব সময়।

কিন্তু সব মনস্তত্ত্ববিদের মতোই অসিত চ্যাটার্জী নিজেই একটি মনস্তাত্ত্বিক রহস্য—বিশেষ করে তার নিজের কাছে। অনেক ঘটনা সে কিছুতেই বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করতে পারে নি, যার কয়েকটা তার নিজের জীবনে ঘটেছে এবং বাদবাকীগুলো এমন লোকের কাছে শুনেছে যাদের অবিশ্বাস করবার কোনো কারণ নেই। তবে সেসব ঘটনা নিয়ে কোনোদিন তলিয়ে ভাবে নি, কাউকে বলেও নি। জীবনের যেই পরিচ্ছেদে এই ঘটনাগুলো জেনেছে, কাউকে সেই পরিচ্ছেদের সন্ধান দিতে সে নারাজ। তাই সে-সব ঘটনা সে কোথাও লিপিবদ্ধ করে নি, এমন কি নিজের ব্যক্তিগত ডাইরিতেও নয়।

শুধু মাঝে মাঝে ছুটির দিনের থমথমে নিঃসাড় নির্জন নিঃসঙ্গ সন্ধ্যেবেলা যখন তার হাতে কোনো কাজ থাকে না, তখন একলা বসে জানলার বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে উল্টে যায় স্মরণের পাতাগুলো। মনে পড়ে বনানী মৈত্রের বাড়িতে তাদের

কয়েকজনের রোববার সন্ধ্যার জমজমাট আসর। সেখানে সবার নানারকম অভিজ্ঞতার নানারকম ঘটনার গল্প, আর বনানীর হাতের তৈরী চায়ের পর চা আর শিঙাড়া আর পকৌড়ি।

সে অনেক বছর আগেকার কথা। অসিত তখন এম. এস. সি. পাশ করে রিসার্চ করছে ইউনিভার্সিটিতে।

সেই বনানীর সঙ্গে প্রথম আলাপ—কোথায় যেন? ভুরু কুঁচকে মনে করবার চেষ্টা করে অসিত চ্যাটার্জী। হ্যাঁ, পার্ক স্ট্রীটের একটি নিলামঘরে। সেখান থেকে সবাই মিলে বনানীদের বাড়ি। সেখানে একটি গল্প বলেছিলো—কি যেন ভদ্রলোকের নাম? হ্যাঁ, অমরেশ গুপ্ত।

মায়ামুকুর—একটি ড্রেসিং-টেবিলের আয়না। তারই এক গা-ছমছমে কাহিনী।

পার্কস্ট্রীটের বিখ্যাত নিলাম-ঘর স্থামুএল্স্।

সেবার কাগজে ওদের বিজ্ঞাপন বার হোলো—তাদের ওখান থেকে নিলাম করা হচ্ছে নানারকমের ভালো ভালো আসবাবপত্র। সেগুলো যাঁর সম্পত্তি তিনি ছিলেন শহরের একজন বিশিষ্ট রুচিবান ধনী, যাঁর ফার্নিচার-সংগ্রহের খ্যাতি ছিলো সমঝদার মহলে।

অসিতের বন্ধু পরিতোষ কয়েকদিন ধরে একটি ভালো সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড ড্রেসিং টেবিল খুঁজে বেড়াচ্ছিলো তার বৌয়ের জন্যে। বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়তেই সে তার আগ্রহ প্রকাশ করলো।

অসিত বললো, "বেশ তো, চলো, দেখে আসি কি কি নিলামে পাওয়া যাচ্ছে।"

সেদিন বিকেলবেলা দুজনে মিলে দেখতে গেল স্যাম্যুএল্‌স্‌-এ। সেখানে তখন বেশ ভিড়, অনেকে দেখতে এসেছে। তাদের মধ্যে দেখা গেল পরিতোষের পরিচিত এক লাহিড়ী দম্পতিকে। তাদের সঙ্গে আছে আরো তিন চার জন।

"আরে, তুমিও এসেছো?" পরিতোষকে দেখে লাহিড়ীমশাই বললেন। "কী ব্যাপার? আজ যেন অল রোডস্‌ লীড্‌ টু স্যাম্যুএল্‌স্‌! দেখেছো সব? বেশ ভালো ভালো আসবাবপত্তর সব, না? মনে হচ্ছে সস্তায়ই পাওয়া যাবে।"

পরিতোষ অপূর্ব লাহিড়ী আর তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে অসিতের আলাপ করিয়ে দিলো। অপূর্ব লাহিড়ী তাঁদের সঙ্গী এবং সঙ্গিনীদের সঙ্গে এদের আলাপ করিয়ে দিলো।

—ইনি অমরেশ গুপ্ত। আমাদের বিশেষ বন্ধু। বিলেতে আমরা একসঙ্গে থাকতাম।......ইনি কান্তি রায়চৌধুরী।......ইনি মিসেস রায়চৌধুরী।......বিভূতি দত্ত। খুব নাম করা সাংবাদিক। দি সেন্টিনেল কাগজের চীফ রিপোর্টার।...আর এ আমার শ্যালিকা, বনানী মৈত্র।—

অসিত একবার চোখ তুলে তাকালো।

মেয়েটির দোহারা গড়ন, স্নিগ্ধ শান্ত চোখ, খুব ফরসা রং।

ইতিমধ্যে পরিতোষ ঘুরে ঘুরে সবই একবার দেখে নিয়েছে। বললো, "কাঠগুলো খুবই দামী। বর্মী সেগুন নিশ্চয়ই। কী চমৎকার পলিশ দেখেছেন? একেবারে নতুন বলে মনে হয়। কিন্তু, আমি যে জিনিসের খোঁজে এসেছি, সেটা পাচ্ছিনা যে!"

"কোনো স্পেশিয়্যাল কিছু?" জিজ্ঞেস করলেন অপূর্ব লাহিড়ী।

"হ্যাঁ, একটা ভালো ড্রেসিং টেবিল খুঁজছি।"

"তোমার বৌয়ের জন্যে?"

"নইলে আর কার জন্যে," হেসে বললেন মিসেস লাহিড়ী।

পরিতোষ হাসলো একটু।

"আমি হলে,"—অমরেশ গুপ্ত বললেন, "আমার বৌকে কোনো-দিনই সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড ড্রেসিং-টেবিল কিনে দিতাম না। তৈরী করিয়ে দিতাম নতুন ড্রেসিং-টেবিল।"

"টাকা থাকলে—" শুরু করলো পরিতোষ।

বাধা দিয়ে গুপ্ত তাড়াতাড়ি বললে, "না, না, টাকা পয়সার কথা এটা নয়। টাকা না থাকলেও, দিতে হলে আমি নতুন জিনিসই দিতাম। ওটা আমার প্রিন্সিপ্‌ল্‌।"

"বেশ ভালো প্রিন্সিপ্‌ল্‌," বললেন মিসেস লাহিড়ী, "সব স্বামীরই এরকম প্রিন্সিপ্‌ল্‌ থাকা উচিত।

"বেশ অসুবিধেজনক প্রিন্সিপ্‌ল্‌," উত্তর দিলেন অপূর্ব লাহিড়ী।

"কিন্তু আপনার এরকম একটি প্রিন্সিপ্‌ল্‌ কেন," অসিত চ্যাটার্জী জিজ্ঞেস করলো।"

"আমাদের গুপ্ত সায়েব যে কোনো প্রিন্সিপ্‌ল্‌-এর ধার ধারেন বলে আমার তো জানা ছিলো না," বললো বিভূতি দত্ত।

"সব ব্যাপারে নয়," গুপ্ত উত্তর দিলো, "সংসারের যে কোনো জিনিসই আমি সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড কিনে দিতে রাজী আছি আমার স্ত্রীকে। এমন কি, আমি নিজেও তো সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড স্বামী। আমার স্ত্রী আমার দ্বিতীয় পক্ষ।—কিন্তু ড্রেসিং-টেবিল আমি কিনবো নতুন, অর্ডার দিয়ে তৈরী করানো।"

"কেন, ড্রেসিং-টেবিল সম্বন্ধে এই পক্ষপাতিত্ব কেন," জিজ্ঞেস করলেন মিসেস লাহিড়ী।

"সে এক অদ্ভুত গল্প," বললো অমরেশ গুপ্ত।

হাতের উপর মুখ রেখে আমরা মিস্টার গুপ্তকে ঘিরে বসলাম পার্ক স্ট্রীটের একটি টি-রুমে। আমাদের প্রত্যেকের দৃষ্টি তাঁর উপর

নিবদ্ধ। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে গুপ্ত সাহেব শুরু করলো তার গল্প।

"তোমরা নীহার কুণ্ডুর নাম শুনেছো তো?"—গুপ্ত বললে—"হ্যাঁ, হ্যাঁ—ইউনিভার্সিটির সেই ব্রিলিয়্যাণ্ট ছাত্রটি, যাকে গত বছরের আগের বছর ফরেইন সার্ভিসে মনোনীত করা হয়েছিলো। তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছো যে এই নমিনেশানের ঠিক একমাস পরে এক অদ্ভুত অসুখে ভুগে সে মারা যায়, যে অসুখ কলকাতার বড়ো বড়ো ডাক্তারেরাও ধরতে পারে নি। যদিও কোনো ডাক্তারই তার রোগ ধরতে পারে নি, আমাদের মধ্যে কিন্তু কেউ কেউ জানতো কি অবস্থায় এবং কেন সে এই অসুখে পড়লো আর মারা গেল।

নীহার কুণ্ডুর বিয়ের ঠিক হয়েছিলো সুজাতা মাইতির সঙ্গে, সেই লক্ষপতি বুড়ো মাইতির একমাত্র সন্তান। যেদিন নীহারের ফরেইন সার্ভিসে নমিনেশানের খবর এলো, পুরীর সমুদ্রের জলে ডুবে মারা গেল সুজাতা মাইতি। এদের বিয়ের ঠিক হওয়ার পেছনে যে দীর্ঘ ভালোবাসার ইতিহাস আছে সে সম্বন্ধে তোমাদের আমি অনেক কিছুই বলতে পারতাম, কিন্তু এসব আরেকদিন বলা যাবে, কারণ যে গল্পটা বলছি এর সঙ্গে ওসব রোমান্সের আর ট্র্যাজেডির কোনো সম্পর্ক নেই। এটা একেবারে অন্য ব্যাপার। আরো বেশী রোমাণ্টিক, একটু ভয় ভয় করানো, গা ছমছমানো, কিন্তু আরো বেশী মিষ্টি।

একমাত্র সন্তান মারা যাওয়ায় বুড়ো মাইতির মন ভেঙে গেল। সে অনেক আশা করছিলো এ বিয়ের উপর। এ বিয়েটা কলকাতার অভিজাত সমাজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জমকালো অনুষ্ঠান যাতে হয় সেজন্যে সমস্ত আয়োজন করে রেখেছিলো। গয়নাগাটি, আসবাবপত্র সব তৈরী করানো হয়েছিলো একবছর ধরে। চাল ডাল প্রভৃতি গুদামজাত করা হয়েছিলো, ময়রা, কনফেকশনার রোশনচৌকি ডেকরেটার সবাইকে বায়না দেওয়া হয়ে গিয়েছিলো, মোটমাট অজস্র ধনী

বাঙালীবাড়িতে একমাত্র সন্তানের বিয়েতে যা যা করা হয়ে থাকে সবই করা হয়েছিলো পয়সার মায়া না করে। সুতরাং বুঝতেই পারছো কতোখানি মনে লেগেছিলো বুড়ো মাইতির। চালডাল আনাজপত্র লাগলো শ্রাদ্ধের কাজে। শানাই রোশনচৌকি ওদের আগাম দেওয়া টাকা ফিরিয়ে দিতে এসে চোখের জল ফেলে চলে গেল, ডেকরেটার মন ভার করে সাজিয়ে দিলো শ্রাদ্ধের প্যাণ্ডাল। ময়রার মিষ্টি এলো শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রিতদের জন্যে। বুড়ো মাইতি মেয়ের বিয়ের গয়নাগাটি বিলিয়ে দিলো আত্মীয়মহলের অনূঢ়া মেয়েদের। বিয়ের ফার্নিচার বেচে দেওয়া হলো নিলাম করে—

আর সেই নিলাম থেকে আমি একটি ভারি চমৎকার ড্রেসিং টেবিল কিনলাম আমার বৌয়ের জন্যে।

কিনলাম খুব সস্তায়। ওর আসল দামের পাঁচ ভাগের এক ভাগে। লম্বা আয়নাটি ছিলো চমৎকার দেখতে, তাতে কি রকম একটা নীলাভ আভা। আমদানী করা বিদেশী আয়নাও এত ভালো হয় না। আর বাঁধানো ছিলো অত্যন্ত দামী সেগুন কাঠে। পেয়ে বৌ খুব খুশী—আর আমায় এমন সব মিষ্টি মিষ্টি কমপ্লিমেণ্ট দিলো যা খুব কম স্বামীরই জোটে।

বৌ একেবারে প্রেমেই পড়ে গেল আয়নাটির সঙ্গে। প্রথম যেদিন বাড়িতে আনলাম ড্রেসিং টেবিলটি, বৌ তার সামনে দাঁড়িয়ে সাজ গোজ করলো ঘণ্টা দুই ধরে। বৌয়ের কোথায় যেন বেরোনোর কথা ছিলো কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর বেরোনোই হোলো না। সাজ গোজ করতে করতেই বেলা পড়ে গেল, সময় কেটে গেল। সারাক্ষণ বৌ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নয় বসে। আমায় বললে, "কী চমৎকার আয়না। এর কাছ-ছাড়া হতে ইচ্ছে করছে না আমার। আমায় তোমরা সবাই সুন্দর বলো বটে, কিন্তু আমি নিজের চেহারা দেখে খুশী হলাম জীবনে এই প্রথম।"

আর বিশ্বাস করো আমায়, আয়নার স্নিগ্ধ নীল আভায় বৌয়ের চেহারা সত্যই ভারী মিষ্টি, ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিলো।

কিন্তু এমন কিছু আশ্চর্য হবার মতো মনে হয় নি আমার। শুধু মনে হয়েছিলো ড্রেসিং টেবিলটা বেশ একটি কুশলী শিল্পীর হাতে তৈরী।

রাত্তিরে খাওয়া দাওয়ার পর বৌ আবার জামাকাপড় পাল্টে চুল আঁচড়ে নিলো আয়নার সামনে দাড়িয়ে। এবার আমার মনে হোলো যেন বড় বেশী সময় নিচ্ছে আমার বৌ—ঘুমুতে যাওয়ার আগে সব স্বামীরই যেমন মনে হয়। একটু অধৈর্য হয়ে পড়লাম আমি। শেষ পর্যন্ত আমাকেই উঠে পড়ে সুইচ অফ করে বৌকে টেনে আনতে হোলো শুয়ে পড়বার জন্যে। তা নইলে যেন সে আসতোই না।

শেষ পর্যন্ত ঘুমিয়েও পড়লাম দুজনে, বিছানায় শুয়ে পড়ার যতক্ষণ পরে স্বামী-স্ত্রী ঘুমিয়ে পড়ে, ঠিক ততক্ষণ পরে।

তখন বোধ হয় মাঝ-রাত্তিরেরও অনেকক্ষণ পর, বাইরে চাঁদ চলে পড়েছে নিম গাছের আড়ালে, আর বহুদূরে থেকে থেকে ডেকে উঠছে কাদের বাড়ির কুকুর। হঠাৎ চমকে উঠে লাফিয়ে উঠলাম বিছানা থেকে। জেগে গিয়েছিলাম বৌয়ের চিৎকার শুনে। উঠে পড়ে দেখি ঘরে আলো জ্বলছে, আর বৌ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ড্রয়ারগুলোর উপর হাতের ভর দিয়ে ঝুঁকে পড়েছে সামনে, আর থর থর করে কাঁপছে তার সারা শরীর।

উঠে গিয়ে ধরলাম বৌকে। "কি হোলো তোমার," জিজ্ঞেস করলাম।

বৌ অস্ফুট সাড়ায় বললে, "ওই আয়নার ভেতর আরেকটি মেয়ে আছে।"

ভাবলাম, একি ছেলেমানুষি করছে বৌ। মাথা খারাপ, না কি? কিন্তু যেভাবে বললো তাতে আমি ঘুরে দাঁড়ালাম আয়নার দিকে।

দেখলাম সেখানে কিছু নেই, যা থাকবার কথা নয়। শুধু আয়নার ভেতর আমার বৌ আমার বাহুর বাঁধনে ছোটো পাখির-ছানার মতো মুখ লুকিয়ে আছে, আর আমার প্রতিবিম্ব তাকিয়ে আছে আমারই দিকে।

"নিশ্চয়ই একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখেছো তুমি। এখন শোবে এসো," বলে বৌকে নিয়ে এলাম বিছানায়।

তারপর দিন সকালে দেখলাম বৌ আবার টাটকা হয়ে উঠেছে সত্ত ফোটা ফুলের মতো, যেমনি আর দু-দশজনের বৌ টাটকা হয়ে ওঠে সকাল বেলায়, এক-ঘুম রাত্তিরের পর। আগের দিন রাত্তিরের ব্যাপার নিয়ে বৌকে এক-আধটু ঠাট্টাও করলাম, অন্যান্য স্বামীরা যেমন করে থাকে। দুপুরে খাওয়ার সময়ের মধ্যে ভুলেই গেলাম সমস্ত ব্যাপারটা, অন্যান্য স্বামীরা যেমনি ভুলে যায়, নিজেকে হারিয়ে ফেললাম দৈনন্দিন কাজের ভিড়ে।

প্রায় হপ্তাখানেক পর একদিন লক্ষ্য করলাম বৌয়ের চেহারা বড়ো ফ্যাকাশে। চোখের চারদিকে কালো দাগ পড়েছে।

"কি ব্যাপার ভাই বৌ," জিজ্ঞেস করলাম তাকে, "তোমার কি শরীর খারাপ হয়েছে নাকি?"

বৌ যা বললে শুনে আমি অবাক। বিশ্বাসই করতে পারলাম না তার কথাগুলো।

ড্রেসিং-টেবিলটা আমার বৌকে পেয়ে বসেছে। সেটি একটি অবসেশান হয়ে দাঁড়িয়েছে তার কাছে। সারাদিন বেশির ভাগ সময় সে ড্রেসিং-টেবিলটির কাছেই কাটায়, কাপড় ছাড়ে আর কাপড় পরে, চুল আঁচড়ায় আর চুল বাঁধে, মেক-আপ করে আর মেক-আপ মোছে। কিন্তু কোনো কিছুই বেরোনোর জন্যে নয়। প্রসাধন করা যা কিছু সবটাই সর্বক্ষণ ড্রেসিং আয়নার কাছে কাছে থাকবার জন্যেই। আমি অবশ্যি লক্ষ্য করেছিলাম কিন্তু এমন কিছু সিরিয়াসলি নিই নি।

মেয়েদের ব্যাপার, বোঝোই তো, ড্রেসিং-টেবিলকে কেন্দ্র করেই তাদের জীবন। তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবে যে একটি মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পাঁচ বছর পরও তার মনের স্বাভাবিক অবস্থা বা অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে পার্থক্য বুঝে ওঠা যে কোনো স্বামীর পক্ষেই অসম্ভব। তাই আমি এমন কিছু গা করি নি। সে সারাদিনই ড্রেসিং টেবিলের সামনে, আর আমি অত্যন্ত খুশী পারিবারিক শান্তির জন্যে।

কিন্তু বৌয়ের মুখে যা শুনলাম তাতে আমার চক্ষুস্থির। প্রত্যেক দিন রাত্তিরে ঠিক রাত বারোটার সময়, বৌয়ের একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা হোতো বিছানা ছেড়ে আলো জেলে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ানোর। আমি টের পেতাম না, কারণ সব পুরোনো স্বামীর মতো আমিও খুব ঘুম-কাতুরে কুম্ভকর্ণ। আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ানোর অদম্য ইচ্ছেটা বৌ কিছুতেই রুখতে পারতো না। সে উঠে যেতো আর আয়নার সামনে গিয়ে দেখতে পেতো একটা অদ্ভুত ব্যাপার। কয়েক মুহূর্তের জন্যে মিলিয়ে যেতো আয়নার মধ্যে তার নিজের প্রতিবিম্ব। আর সেখানে ফুটে উঠতো আরেকটি অচেনা সুন্দর মেয়ের ছবি। কয়েক মুহূর্ত পর সেটা মিলিয়ে যেতো, ফিরে আসতো বৌয়ের প্রতিবিম্ব।

ভাবলাম, নিশ্চয়ই কোনো মাথার গণ্ডগোল হয়েছে বৌয়ের। মনে মনে ঠিক করে নিলাম পরদিনই ডাক্তারবাবুকে ডাকতে হবে। আর ভাবলাম আজকের রাতটা বৌয়ের জন্যে জেগেই কাটাবো, যাতে কাল বৌকে বলতে পারি এসব কিছুই না, সবই তোমার মনগড়া কল্পনা।

সেদিন রাত্তিরে যখন এ-বাড়ি ও-বাড়ি আর দূর চার্চের ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজলো আমি তখন একটি সোফায় বসে আগাথা

ক্রিস্টির লেখা ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়ছি। বৌ ঘুমোচ্ছিলো বিছানায়। হঠাৎ দেখি বৌ উঠে বসেছে বিছানার উপর। একেবারে অদ্ভুত ভাবে বদলে গেছে তার মুখের ভাব, চোখের চাউনি। চোখ দুটো যেন ভেসে গেছে বহু দূরে, সিল্কের মতো চুলগুলি খাড়া হয়ে উঠেছে বেড়ালের লোমের মতো, শরীর ঘামে ভেজাভেজা। আমার একটু আশ্চর্য লাগলো তাতে, কারণ তখন শীতকালের মাঝামাঝি। দেখলাম বৌ উঠে এলো বিছানা থেকে, আস্তে আস্তে এসে দাঁড়ালো ড্রেসিং-টেবিলের আয়নার সামনে। তারপর হঠাৎ থরথর করে কাঁপতে শুরু করলো। আমি বইটা রেখে সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লাম, গিয়ে দাঁড়ালাম বৌয়ের পেছনে। কিন্তু বৌকে কিছু বলবার আগেই চোখ পড়লো আয়নার উপর। যা দেখলাম তাতে যেন আইস-ক্রীমের স্রোত বয়ে গেল আমার শিরদাঁড়া বেয়ে।

আয়নার ভেতর আমার বৌয়ের প্রতিবিম্ব নেই—আর আমারও প্রতিবিম্ব নেই, যদিও আমি দাঁড়িয়েছিলাম বৌয়ের ঠিক পেছনেই। আয়নার ভেতর ওধারে একটি ঘর, চমৎকার আসবাবপত্রে সাজানো, কার্পেট পাতা, যে ঘরটি আমাদের শোবার ঘরের প্রতিবিম্ব নয়। আর ঘরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটি ভারী সুন্দর মেয়ে।

আমি চিনলাম তাকে। আগে দেখেছি। সে মেয়েটি সুজাতা মাইতি। শিউরে উঠে আমি ফিরে দাঁড়ালাম, আমাদের ঘরের ভেতর আর কেউ আছে কিনা দেখতে। দেখলাম আর কেউ নেই আমি আর বৌ ছাড়া।

আমি যখন আবার ফিরে দাঁড়ালাম আয়নার দিকে, তখন সে আর নেই।

আমি প্রথমে ভেবেছিলাম এ হয়তো চোখের ভুল। কিন্তু পর পর তিন রাতের পর নিশ্চিত হলাম যে এটা আর যাই হোক

চোখের ভুল নয়। আমিও যে মনের রোগে ভুগছি না সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হবার জন্যে এক সাইকায়াট্রিস্টের কাছে গিয়ে নিজেকে দেখিয়েও এলাম।

বাইরের কাউকে একথা বলতে সাহস করলাম না আমরা, কারণ আমরা জানতাম যে লোকে শুনলে এসব হেসে উড়িয়ে দেবে। কিন্তু যদি বিশ্বাসও করে তা হলে যে আমার শোয়ার ঘর জনসাধারণের জন্য একটি একজিবিশান হয়ে উঠবে—সেও মনঃপূত হলো না। যেহেতু এই ব্যাপারটি আমাদের আর কোনো অসুবিধা ঘটালো না, আমরা শুধু ভাবতে লাগলাম কি করে ড্রেসিং-টেবিলটি অন্য কোথাও পাচার করে দেওয়া যায়। কিন্তু কোনো ব্যবস্থাই হয়ে উঠলো না। শুধু শোয়ার ঘর থেকে সরিয়ে নিয়ে রেখে দিলাম সিঁড়ির পাশে একটি ছোটো কুঠরিতে। তারপর সমস্ত ব্যাপারটা মন থেকে মুছে ফেলতে চেষ্টা করলাম। আমি কাউকে বলি নি। কিন্তু মেয়েদের তো জানো। আমার বৌ তার ত্-একজন বান্ধবীকে ঘটনাটা বললো। কেউ বিশ্বাস করলো না অবশ্যি, শুনে হেসেই উড়িয়ে দিলো, কিন্তু আস্তে আস্তে ব্যাপারটা চেনাশোনার মহলে ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করলো।—আর তারপর একদিন এসে উপস্থিত হোলো নীহার কুণ্ডু।

দেখলাম নীহার কুণ্ডুর আগের সুন্দর চেহারা আর নেই। বড্ড রোগা হয়ে গেছে। বুড়ো মাইতি তাকে ছেলের মতো ভালবাসতো, তাকে দিয়েও দিতে চেয়েছিলো নিজের সমস্ত সম্পত্তি, বিয়ে দিতে চেয়েছিলো অন্য মেয়ে দেখে শুনে। কিন্তু সে রাজী হয় নি। আমরা জানতাম যে সে নিজেকে একেবারে কাটিয়ে নিতে চাইছিলো সুজাতার স্মৃতি জড়ানো সব কিছু থেকে, অত্যন্ত অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিলো বিদেশের কোনো একটা রাষ্ট্রদূত-দপ্তরে নিয়োগের জন্তে।

সেদিন রাত্তিরে সিঁড়ির পাশের ছোটো কুঠরিতে নীহার একলাই ঢুকলো। তার অনুরোধে বাইরে রইলাম আমরা। সে

যখন বেরিয়ে এলো তখন দেখলাম তার মুখ হাসি-হাসি কিন্তু ফ্যাকাশে।

ওর কাছ থেকেই জানলাম যে এই ড্রেসিং টেবিলটি সুজাতার বিয়ের জন্যে তৈরী করানো নয়, এটা ছিলো তার পুরোনো ব্যক্তিগত সম্পত্তি। নীহার সেটি আমাদের থেকে কিনে নিতে চাইলো। একটু ভেবে আমরা বললাম বেচবো কি বেচবো না সে কথা হপ্তাখানেক পরে জানাবো। আমাদের মনে হোলো যেন তার মা বাবা আর আমাদের বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কথা না বলে এ জিনিস তার কাছে বেচে দেওয়া ঠিক হবে না।

সে তার পর দিন আবার এলো, তার পর দিনও।

ইতিমধ্যে আমরা ব্যাপারটা জানিয়ে দিলাম তার মা বাবা আর আমাদের কয়েকজন বন্ধুকে। ওরা শুনে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলো। নীহারের বাবা আমায় বললে—ওটা যেন আমরা বেচে না দিয়ে কোথাও ফেলে দিই। আমার ক্ষতি যেটা হবে সে উনি মিটিয়ে দেবেন। ঠিক হোলো যে পরের রোববার টেবিল থেকে আয়নাটা খুলে নিয়ে কোথাও ফেলে দিয়ে আসবো। দেখলাম যে এটা কলকাতার বাইরে কোথাও নিয়ে নির্জন কোনো মাঠে বা জঙ্গলে ফেলে দিতে হবে, তা নইলে শহরের ভিতর কোথাও একটি ড্রেসিং টেবিল ফেলে দেওয়ার দৃশ্য জনতা আকর্ষণ করতে পারে। আমি বলেছিলাম ওটা ভেঙে ফেলতে কিন্তু তাতে কেউ রাজী হয় নি। সবাই ভাবলো কোথাও নিয়ে ফেলে দেওয়াই সব চেয়ে ভালো। আমাদের বলে দেওয়া হোলো এ খবর যেন কাউকে না দিই, বিশেষ করে নীহার যেন না জানতে পারে আমাদের প্ল্যান।

তার পরদিন কিন্তু নীহার এলো না। আমাদের একটু কি রকম যেন লাগলো ওর না-আসাটা। পরের দিন ওর বাবা টেলিফোনে ডাকলেন আমাদের।

নীহারের ভীষণ অসুখ। জ্বরে অচেতন হয়ে প্রচুর প্রলাপ বকছে। অদ্ভুত তার রোগ। কি অসুখ, কোন ডাক্তারই ধরতে পারছে না। শরীর জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে, কিন্তু গায়ের, তাপ থার্মোমিটারে দেখাচ্ছে স্বাভাবিকের অনেক নিচে।

ওর বাপ ভাবলো এসব নিশ্চয়ই সেই ড্রেসিং-টেবিলের জন্যে। তিনি আমাদের বার বার মনে করিয়ে দিলেন, পরের রোববার যেন আমরা আমাদের কর্ত্তব্য ভুলে না যাই। আমরা বললাম, আপনি নিশ্চিন্ত হোন, রোববার দিন ড্রেসিং টেবিল কোথাও নিয়ে ফেলে দিয়ে আসা হবেই।

তারপর একটি অদ্ভুত ব্যাপার ঘটলো শনিবার দিন রাত্তিরে। আমাদের দুজন বন্ধুকে খেতে বলেছিলাম আমাদের ওখানে। খাওয়া দাওয়ার পর ব্রিজ খেলছি ড্রইং-রুমে বসে। কত দেরি হয়েছে খেয়াল নেই। হঠাৎ দেখি ঘড়িতে বারোটা বাজছে। এমন সময় শুনি বাইরে গেট খোলার আওয়াজ, কে যেন আসছে। কিন্তু এত রাত্তিরে কে? আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে গেলাম দেখতে, কিন্তু ঘর থেকে বেরোনোর আগেই দেখি বসবার ঘরের খোলা দরজা দিয়ে ঢুকলো নীহার কুণ্ডু। কিন্তু তার তো অসুখ। বিছানা ছেড়ে উঠে আসবার কথা তো নয়? ভাবলাম, এতটা পথ এলো কি করে। দেখে মনে হোলো যেন সে হাঁটছে তার ঘুমের ঘোরে। আমার বৌয়ের প্রশ্নের কোনো উত্তর দিলো না সে, আমার কথাও তার কানে ঢুকলো না, আমাদের পেরিয়ে হেঁটে গেল, সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল উপরে, গিয়ে ঢুকলো সিঁড়ির পাশের ছোটো কুঠরিতে।

আমরা ছুটে গেলাম পেছন পেছন, এই অসুস্থ অবস্থায় একলা কুঠরিতে ঢুকে পড়া তার পক্ষে নিরাপদ নয় ভেবে। সে দরজা ভেজিয়ে দিয়েছিলো কুঠরির। আমাদের ঢুকতে হোলো দরজা ঠেলে—

আর ঢুকে দেখি নীহার নেই ঘরের ভেতর, কেউ নেই। ড্রেসিং-টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে হঠাৎ শিউরে উঠলাম আমরা সবাই। আয়নার উপর থেকে আমাদের প্রতিবিম্ব মুছে গেছে, সেখানে ফুটে উঠেছে সুজাতা মাইতির প্রতিবিম্ব, ফুঁপিয়ে কাঁদছে আরেকটি প্রতিবিম্বের বুকে মুখ লুকিয়ে।

অন্যজন—সে নীহার কুণ্ডু।

কয়েক মুহূর্ত পর প্রতিবিম্বের পট মুছে গেল। দেখলাম ভয়ার্ত চোখে আমরা তাকিয়ে আছি আমাদের নিজেদের প্রতিবিম্বের দিকেই।

আস্তে আস্তে আমরা বেরিয়ে এলাম সে-ঘর থেকে। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এসে বসলাম বাইরের ঘরে।

একটু ভাবলাম আমি। তারপর টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিলাম।

লাইনের অন্যদিকে নীহারের বাবা।

আমি কিছু বলার আগেই তিনি কথা বললেন।

বারোটা বাজবার পাঁচমিনিট আগে প্রবল জ্বরে অচেতন অবস্থায় মারা গেছে নীহার কুণ্ডু।

সবাই চুপচাপ বসে শুনলাম গুপ্ত সাহেবের গল্প। ও যখন থামলো তখন সবার কাপে চা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। কিন্তু বেয়ারাকে ডেকে আরেক পট চা আনতে বলবার ইচ্ছে হোলো না একজনেরও।

তিনচারদিন পরে বনানী মৈত্রের সঙ্গে অসিত চ্যাটার্জীর হঠাৎ দেখা হয়ে গেল নিউমার্কেটে।

"সেদিন সায়েন্স কলেজে আপনার খোঁজে গিয়েছিলাম," বনানী বললো, "কিন্তু তার আগেই আপনি চলে গিয়েছিলেন। আজ কালের মধ্যেই দিদি আর অপূর্ব-দা'কে নিয়ে আপনার বাড়ি যেতাম। আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালোই হোলো।"

"কেন, কি ব্যাপার?" জিজ্ঞেস করলো অপূর্ব।

"আগামী রোববার রাত্তিরে আপনি আমাদের বাড়িতে খাবেন।"

অসিত আকাশ থেকে পড়লো। তার সঙ্গে সবে সেদিন আলাপ, এরই মধ্যে খাওয়ার নেমন্তন্ন!

বনানী বললো, "পরিতোষবাবু, দিদি, অপূর্ব-দা, অমরেশবাবু, কান্তিবাবু, মিসেস রায়চৌধুরী, বিভূতিবাবু—এঁরা সবাই আসছেন। তাছাড়া আরো কয়েকজন আসছেন। ওঁদের সঙ্গে আলাপ করে আপনি খুশী হবেন। আর আপনার কথাও আমরা অনেক শুনেছি। আপনি এলে খুব খুশী হবো। আসবেন তো?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আসবো। কিন্তু উপলক্ষটা কি?"

"প্রত্যেক রোববারে আমার ওখানে একটা আসর বসে। সাহিত্য বা গান বাজনা ওসব কিছু নয়। এমনি গল্প। এরা এক একজন পালা করে এক একটি গল্প বলে। এবং সে গল্প যতো অসম্ভব অবাস্তব হয়, ততোই ভালো। তবে সেটা নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অথবা যার জীবনে ঘটেছে তার কাছ থেকে শোনা গল্প হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আপনি তো সাইকলজিতে রিসার্চ করছেন। আপনার ভালো লাগবে।"

"হ্যাঁ, আসবো," অসিত উত্তর দিলো, "প্রত্যেক রোববার?"

"হ্যাঁ। তবে আসর সাধারণত বসে বিকেলবেলা। কিন্তু এ-রোববার আমাদের আসরের ঠিক এক বছর পূর্ণ হবে বলে রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আসবেন। কেমন?"

"আসবো, কিন্তু একটি শর্তে," অসিত একটু হেসে বললো।

"কি শর্ত ?"

"এখন আপনি আমার সঙ্গে কাছাকাছি কোথাও বসে চা খাবেন।"

বনানী হেসে ফেললো। বললো, "আপনারা সাইকলজিস্ট। আপনাদের সঙ্গে বেশীক্ষণ বসে কথা বলতে ভয় হয়। কে জানে কোন সামান্য কথা থেকে মনের সমস্ত খবর জেনে নেবেন।"

অসিত খুব আস্তে আস্তে উত্তর দিলো, "সাইকলজিস্ট বলে পরিচিত হওয়ার অসুবিধে অনেক। কেমিস্ট্রি বা ম্যাথম্যাটিক্সের লোক হয়ে যে কথা নির্ভয়ে বলা যায়, সাইকলজিস্ট হলে সে কথা অনেক ভয়ে ভয়ে বলতে হয়।"

বনানীর কান হুটো একটু লাল হোলো।

পরের রোববার সন্ধ্যার পর অসিত গেল বনানীর বাড়ি। দেখলো অনেকেই এসেছে। বেশির ভাগই চেনা লোক, অপরিচিতও কয়েকজন আছে।

সেদিন এক ডিসেম্বরের রাত। ঠাণ্ডা।—এত ঠাণ্ডা যে পথে লোকজন নেই। চারদিকে দরজা জানলা সব বন্ধ। আশেপাশের বাড়িগুলো সবই অন্ধকার। যে কয়েকটা বাড়ির একটা বা হুটো জানলা এখনো খোলা, আর নরম আলো বেরিয়ে এসে ছড়িয়ে পড়েছে পথের উপর, সেসব বাড়িতেও কোনো লোকজনের সাড়াশব্দ নেই। একেবারে চুপচাপ, নিস্তব্ধ।

খাওয়াদাওয়া শেষ হওয়ার পর সবাই এসে জমিয়ে বসলো বাইরের ঘরে। অফুরন্ত সিগারেট-শৃঙ্খল আর নানা রকম গুজব আর গল্প। সে সব গল্পের অনেক কিছু হয়তো দিনের আলোয় মনে হবে বৈচিত্র্যহীন নয়তো বা ছেলেমানুষী—কিন্তু অত্যন্ত জমজমাট আর রোমাঞ্চকর মনে হয় এরকম হিমেল নিশীথে, যখন রাত বেশী হয়ে

এসেছে, যখন শরীরের অভ্যন্তর ভালো হাতের রান্নায় পরিপূর্ণভাবে ঠাসা এবং তখন অত্যন্ত আলস্য বোধ হয় বাড়ি ফিরে যাওয়ার কথা ভাবতেও।

বনানী মৈত্রের বাড়ির লোকজনেরও যেন আপত্তি নেই। ওঁরা সে-ধরনের লোক যাঁরা নৈশ ভোজনে আমন্ত্রিত অতিথিকে পরদিন সকালের চা না খাইয়ে বাড়ি ফিরতে দিতে চান না।

কান্তি রায়চৌধুরী একটি মজার গল্প বলেছিলো তার এক বন্ধুর সম্বন্ধে। কিছুদিন আগে সে নাকি গিয়েছিলো কোনো এক মফস্বল শহরে এক বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে। সেখানে গিয়ে ভুল করে উঠে পড়লো অন্য এক বাড়িতে যেখানে ওরাও প্রত্যাশা করছিলো একজন অতিথির, যাকে সে-বাড়ির লোকে চিনতো না, আগে দেখেও নি, কারণ সে ছিলো সে-বাড়ির এক ছেলের বন্ধু এবং ছেলেটি ছিলো সেনাবিভাগে, থাকতো আসামে। এই প্রত্যাশিত এবং অপরিচিত অতিথি থাকতো তারই সঙ্গে। আসাম থেকে আগেই ছেলের চিঠি পেয়ে বাড়ির লোকেরা সেই অতিথির অপেক্ষা করছিলো। সুতরাং সেখানে ভুল লোক গিয়ে পড়ায় প্রথমটা কেউ কিছু বুঝতে পারলো না, সব কিছু গোল পাকিয়ে গেল। ভুল অতিথির সঙ্গে আসল অতিথির বন্ধুর বোনের প্রেম হোলো। আসল অতিথি যখন এসে উপস্থিত হোলো তখন ব্যাপারটা বহুদূর গড়িয়েছে। আসল অতিথি অনুভব করলো যে তার উপর একটা অবিচার হয়েছে। কয়েকটা ঝোড়ো ঘটনা ঘটে গেল। আসল অতিথি আর ভুল অতিথিতে সংঘর্ষ বাধলো। আসল অতিথি আর্মি অফিসার। সে সামরিক পদ্ধতিতে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করতে চাইলো। কিন্তু পারলো না। তাকে হটে যেতে হোলো। তারপর ভুল অতিথির সঙ্গে নির্ভুল মেয়ের বিয়ে হয়ে সমস্ত ব্যাপারটার একটা মধুর পরিসমাপ্তি ঘটলো।

কাহিনীটা শুনে অনেকেরই মনে হোলো সমস্ত ব্যাপারটা বড়ো অবাস্তব, বড্ডো সঙ্গতিহীন। তবু এই গল্প সবাইকে প্রচুর আনন্দ ও হাসির খোরাক দিলো—এবং তার অনেকটা হয়তো গল্পটা বলার ধরনের জন্যেই।

অসিতের পাশে বসেছিলো সিদ্ধার্থ বোস নামে এক অধ্যাপক। সে জিজ্ঞেস করলো হঠাৎ, "কিন্তু এ-রকম একটা ভুল হওয়া কি সম্ভব? বাড়িতে একজন এলে কি কেউ তার নাম ধাম কিছুই জিজ্ঞেস করে না? আমার তো মনে হয় দু-মিনিটের মধ্যেই ধরে ফেলা যায় যে একটা ভুল হয়ে গেছে কোথাও।"

এ-রকম এক রাত্তিরে এমন একটি গল্পের রস কিছুতেই নষ্ট হয়ে যেতে দেওয়া যায় না সন্দেহের প্রশ্ন তুলে, কারণ গল্পটি সবারই শুনতে ভালো লেগেছে। তাই পরিতোষ আরেকটি সিগারেট ধরিয়ে বললো, "দেখুন প্রফেসার বোস, এ-রকম ভুল অস্বাভাবিক হতে পারে কিন্তু একেবারে অসম্ভব নয়। আমি নিজে একটা ঘটনা জানি যেখানে প্রায় এ-রকমই একটা ভুল হয়েছিলো কিন্তু যার পরিণতি হয়েছিলো অত্যন্ত গুরুতর। তবে সে গল্প থাক, কারণ কান্তি যে গল্পটা বললো, এ গল্প সে-রকম রসালো নয়। ও-রকম একটা অপ্রীতিকর গল্প বলে আপনাদের বিরক্তি ধরিয়ে দিতে চাই না। আপনারা কেউ বরং অন্য কোনো গল্প বলুন।"

সবাই এক বাক্যে বললো যে তাঁর গল্পের চেয়ে বেশী রসালো গল্প তাদের মধ্যে কারো জানা নেই, সবাই শুনতে চায় তাঁর গল্পই।

"বেশ শুনুন তবে," পরিতোষ বললো, "কিন্তু উপভোগ করবেন কি না আমার সন্দেহ আছে।"

* * *

"যে ব্যাপারটার কথা বলছি" পরিতোষ শুরু করলো, "সেটা ঘটেছিলো প্রায় দশ বছর আগে। আমি তখন প্রেসিডেন্সি কলেজের

ছাত্র। একটা সুমধুর গরমের ছুটির পর অনার্স ক্লাস সবে শুরু হয়েছে, এমন সময় একটি নতুন ছেলে এলো আগ্রা থেকে, আর ভর্তি হোলো আমাদের ক্লাসে। বেশ চমৎকার তার চেহারা। অত্যন্ত মিশুক আর অমায়িক। কিছুদিনের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব হোলো আমাদের মধ্যে।

সে সময় আমরা থাকতাম লিলুয়ায়। বাবা তখন সবে একটা নতুন বাগান-বাড়ি কিনেছেন লোকালয়ের একটু বাইরে। নতুন গেছি সে অঞ্চলে, কাউকে বড়ো একটা চিনি না। একদিন শনিবার সন্ধ্যায় অনিল বোসকে,—মানে আমার সেই বন্ধুটিকে, ওর নাম অনিল বোস,—চায়ে নেমতন্ন করলাম আমাদের বাড়িতে।

সে বলেছিলো, সে ট্রেনে আসবে, কারণ বাসে চাপতে ওর ভালো লাগে না। যে ট্রেনে তার আসবার কথা সেটা লিলুয়া স্টেশনে আসবে চারটের একটু পরে। আমি অপেক্ষা করছিলাম স্টেশনে, কারণ আমাদের বাড়ি অচেনা লোকের পক্ষে খুঁজে বার করা শক্ত। চারটে বেজে দশ হতে একটি লোকাল ট্রেন এসে চলে গেল। কিন্তু অনিলের দেখা নেই।

তখন জুলাই মাস। সারাদিন টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিলো। বিকেল পড়তে না পড়তে আরো ঘন আরো কালো হয়ে এলো আকাশের মেঘ। মনে হোলো যেন খুব ঝড় বৃষ্টি হবে সন্ধ্যে নাগাদ। ভাবলাম এই আবহাওয়ার দরুণ অনিল হয়তো আর বেরোয় নি হস্টেল থেকে। এর পরের গাড়িটা সাড়ে চারটায়। ভাবলাম সেটা দেখে বাড়ি ফিরে যাবো।

সাড়ে চারটের গাড়িটা আসবার আগেই এমন বেদম বৃষ্টি নামলো যে আমায় আশ্রয় নিতে হোলো একটি চায়ের স্টলে। সাড়ে চারটে বাজতে গাড়ি এলো। দু'চার জন যাত্রী নামলো, তাদের কারো কারো গায়ে বর্ষাতি আর মাথায় টুপি, কেউবা বিপর্যস্ত ছাতার

নিচে জড়োসড়ো। বৃষ্টিতে চারদিক ঝাপসা। তারই ভেতর দিয়ে ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম। কিন্তু অনিল বলে কাউকে মনে হোলো না। মিনিট পনেরো পর বৃষ্টির প্রথম তোড়টা কমতে একটি সাইকেল-রিক্‌শ চেপে বাড়ি ফিরে গেলাম।

সাতটা নাগাদ বৃষ্টি থেমে আকাশ পরিষ্কার হয়ে যেতে বাবা আমায় কি একটা যেন ওষুধ কিনতে পাঠালেন স্টেশনের কাছে একটি দোকানে। দোকান থেকে যখন বেরুচ্ছি হঠাৎ অনিলের সামনা সামনি।

"বাঃ, এতক্ষণে মুখটা দেখালে," আমি বললাম, "চায়ের পক্ষে সময়টা একটু দেরি হয় নি কি? যাই হোক, আবহাওয়াটা ভালো নয়। বাড়িতে খিচুড়ি হচ্ছে। তাই বরং খেয়ে যাও।"

অনিল আমার আপাদমস্তক তাকিয়ে দেখলো, বললো "চায়ের জন্যে আসতে তো দেরি হয় নি আমার। আমি ঠিক সময়েই এসেছিলাম। বেশ গল্পগুজব করে সময় কেটেছে তোমার বাবার সঙ্গে।"

"আমার বাবার সঙ্গে?" আমি অবাক।

"হ্যাঁ, তিনি বললেন, তুমি নাকি কলকাতা গেছ, আগামীকাল ফিরবে। সত্যি, বেশ ছেলে তুমি, তোমার বাবাকে বলোইনি যে আমি আসছি, আর নিজেও বেশ কেটে পড়লে।"

"দাঁড়াও," আমি বললাম, "তুমি ভুল করছো কিছু একটা। সর্বক্ষণ আমি বাড়িতেই ছিলাম। তোমার জন্যে ঘণ্টাখানেক স্টেশনে অপেক্ষা করে তবে আমি বাড়ি গেছি।"

"কী যে বাজে বকছো," অনিল বললো।

"তুমি কোন ট্রেনে এসেছো," আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"যে ট্রেনটা এখানে এলো সাড়ে চারটায়। তখন খুব বৃষ্টি পড়ছে।"

"ও, সেই জন্যে আমি তোমায় দেখতে পাই নি," আমি বললাম।

"তার মানে," অনিল বললো, "যে ভদ্রলোক বললেন তুমি কলকাতা গেছ, তিনি তোমার বাবা ন'ন্?"

"তুমি নিশ্চয় কোনো ভুল বাড়িতে গিয়ে পড়েছিলে," আমি বললাম, "কেন, আমার নাম বলো নি ওঁদের?"

বলবার প্রয়োজন হয়নি অনিলের। বাড়ির কড়া নাড়তেই এক বয়স্ক ভদ্রলোক এসে দরজা খুলে দিলেন। অনিল ভাবলো উনি আমার বাবা। বললো, "আমি হিন্দু হস্টেল থেকে আসছি। ও কোথায়, মানে—"

ভদ্রলোক বোধ হয় একটু ভুল করলেন। হয়তো তাঁর ছেলেও কলকাতায় পড়ে। বললেন, "ও, তুমি ওর সঙ্গে পড়ো বুঝি? কিন্তু সে তো এখন নেই, সেতো কলকাতা গেছে, আজ আর ফিরবে না। ফিরবে কাল বিকেলে।"

"বাঃ, বেশ ছেলে তো," অনিল হতাশ হয়ে বললো, "আমায় নেমন্তন্ন করে এনে সে চলে গেল?"

অনিল চলে আসছিলো, কিন্তু বুড়ো ছাড়লেন না। তিনি ওকে জোর করে ভিতরে নিয়ে বসিয়ে ভালো করে খাইয়ে দাইয়ে বৃষ্টি থামতে তারপর ছাড়লেন। অনিল স্টেশনে ফিরে আসছিলো, পথে আমার সঙ্গে দেখা।

তারপর সে যা বললো তা আরো মধুর। সে-বাড়িতে তার সঙ্গে আলাপ হয়েছে ভারী সুন্দর একটি মেয়ের সঙ্গে যাকে সে এতক্ষণ আমার বোন বলে ভেবেছিলো। এখন যখন জানতে পারলো যে সে-বাড়িটা আমার নয়, সেই বুড়ো আমার বাবা নয়, সেই সুন্দর মেয়েটি আমার বোন নয়, সে তার প্রাণের কথা খুলে বললো। দেহগঠনের যে অঞ্চলে হৃদয় নামক পদার্থটা আছে বলে সবার ধারণা, সেখানে যেন একটু কি রকম লাগছে, অনিল বললো আমায়।

আমি অনিলের পিঠ চাপড়ালাম, অভিনন্দন জানালাম, আর বললাম, "চলো কোন্ বাড়িটা আমায় একবার দেখিয়ে দাও।"

অনেক অনুরোধের পর সে রাজী হোলো। আমায় কথা দিতে হোলো যে আমি ব্যাপারটা কাউকে জানাবো না। সে তখন আমায় নিয়ে গেল বেশ দূরে গঙ্গার ধারে এক নির্জন অঞ্চলে, যেখানে ঝুরি নেমে আসা অজস্র বটগাছ চারদিকে আর এক অন্ধকার প্রান্তে একটি ছোট্টো বাগান-ঘেরা বাড়ি।

কাছাকাছি আসতেই দেখি বাড়িটা বেশ পুরোনো। জানলাগুলো অন্ধকার। মরচে-পড়া তালা ঝুলছে দরজায়। মনে হোলো যেন এ-বাড়িতে বহুকাল কেউ বাস করে নি।

"আশ্চর্য ব্যাপার! এ কি করে হোলো!" অনিল বিস্মিত হয়ে বললো।

"এ-বাড়িটা নিশ্চয়ই নয়," আমি উত্তর দিলাম।

"এ-বাড়িটাই," বললো অনিল, "কিন্তু ওরা সবাই গেল কোথায়?"

"কোথায় যাবে আবার? তুমি নিশ্চয়ই বাড়ি ভুল করছো।"

"সে হতে পারে না," অনিল বললো, "আমার বেশ মনে আছে। আমি ভুলে যাবো কেন? চিরকাল ধরে যার স্বপ্ন দেখে এসেছি, এদ্দিন পরে দেখা হয়ে গেছে তার সঙ্গে। তার ঠিকানা ভুলে গেলে আমার চলবে কেন! আমার ঠিক মনে আছে। এ-বাড়িতেই এসেছি। কিন্তু তখন যে লোকজন ছিলো বাড়িতে!"

আমরা সে অঞ্চল ঘুরে বেড়িয়ে দেখলাম যদি একই রকম দেখতে অন্য কোনো বাড়ি থাকে, কিন্তু আর কোনো বাড়ি পেলাম না। অনিল বললো যে অন্য কোনো পাড়া হতে পারে না, কারণ সে পথ ঘাট চিনে রেখেছে। আর এ অঞ্চলে অন্য কোনো বাড়ি নেই। তার দৃঢ় ধারণা এ বাড়িতেই এসেছে। কিন্তু তাই যদি হবে তো লোকজন সব কোথায় উবে গেল? কম্পাউণ্ডের ভিতর ঢুকে

আমরা নিশ্চিত হলাম যে কেউ থাকে না এ বাড়িতে, আর বাড়ির অন্য কোনো প্রবেশ পথ নেই, শুধু সামনের দিকে একটাই। তাতে তালা ঝুলছে। অনিলের বিস্ময়ের অবধি নেই। কিন্তু আমি নিশ্চিন্ত হলাম যে অনিল আবার বাড়ি ভুল করেছে।

বেশ হাসি পেলো আমার। সারা জীবন যে-মেয়ের স্বপ্ন দেখেছে সে, বাড়ি ভুল করে খোঁজ পেয়েছে তার, আবার বাড়ি ভুল করে হারিয়ে ফেলেছে তাকে,—সত্যি কী মর্মান্তিক ট্রাজেডি!

অনিল কোনো কথা বললো না।

এ বিষয় নিয়ে কোনো কথাবার্তা হোলোনা আমাদের। আমি তাকে নিয়ে গেলাম আমাদের বাড়ি। খাওয়া-দাওয়া করে রাতটা আমাদের ওখানেই কাটালো, পরদিন সকালে উঠে কলকাতায় ফিরে গেল।

সে সময় আমি থাকতাম ব্যাপটিস্ট মিশন হস্টেলে। শুধু শনিবার শনিবার বাড়ি আসতাম। আমিও কলকাতায় চলে এলাম সোমবার সকালে, ক্লাস করতে গেলাম আগের মতো, গিয়ে দেখি অনিলের পাত্তা নেই। একদিন গেল, দু'দিন গেল, চারদিন গেল। কিন্তু হস্টেলেও ওকে পাওয়া যায় না। ও নাকি খুব ভোরে-ভোরে উঠে বেরিয়ে যায়, রাত করে ফেরে। এখনো প্রক্সি চলছে, কবে সুপারিন্টেণ্ডেন্টের কাছে ধরা পড়ে যায়, ওর হস্টেল-বন্ধুদের তাই ভাবনা। কোথায় যায় সে-খবর কিন্তু কেউ জানে না।

ওর সঙ্গে দেখা হোলো পরের সোমবার। সে ক্লাস করতে এলো আগের মতো, তারপর আমায় টেনে নিয়ে গেল রেস্তরাঁয়।

"একটা কথা বলবো?" সে বললো, "আমি বাড়িটা ঠিকই চিনেছিলাম, ওরা ওখানেই থাকে। গত হপ্তায় আমি তিন দিন ধরে ঘুরে ঘুরে খুঁজেছি অন্য কোনো বাড়ি হতে পারে কিনা। কিন্তু পাইনি। তারপর শুক্রবার সন্ধ্যায় সে-বাড়িতেই গিয়ে দেখলাম,

আলো জ্বলছে সেখানে, লোকজন সবাই আছে। দেখা হোলো সবার সঙ্গেই। মেয়েটির সঙ্গেও।

"তা' হলে সেদিন রাত্তিরে ওরা সব কোথায় গিয়েছিলো," আমি জিজ্ঞেস করলাম।

অনিল হেসে উত্তর দিলো, "আর কোনো প্রশ্ন কোরো না আমায়, তাহলে কোনো মিছে কথা শুনতে হবে না তোমাকে।"

আমার প্রচুর অনুরোধ সত্ত্বেও আর কোনো কথা বললো না সে। তার জীবনের এই গোপন পরিচ্ছেদটি রহস্যময় করে গোপন রাখলো তার নিজের মধ্যেই।

পরের শনিবার যখন লিলুয়া গেলাম, বাড়ি ফেরার পথে ও-অঞ্চলটা ঘুরে গেলাম। বললে বিশ্বাস করবেন, কি দেখলাম ? বাড়িটা ফাঁকা, অন্ধকার, নির্জন।

তারপর আবার যখন অনিলের সঙ্গে কলেজে দেখা, তাকে বলতেই সে হাসলো। বললো, "দেখ, তুমি ওদের কোনো দিন খুঁজে পাবে না। সে চেষ্টাও কোরো না।" তাবপর একটু চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে বললো, রোববার দিনও সে সেই বাড়িতে গিয়েছিলো, বেশ চমৎকার সময় কাটিয়েছে ওদের মধ্যে, আর অনেকদূর এগিয়েছে মেয়েটির সঙ্গে।

প্রায় প্রত্যেক সোমবারই সে আমায় তার প্রেমের গল্প শোনাতো। আমি কোনো কথা বলতাম না তাকে। মনে হোতো কোথায় যেন কিছু একটা মিথ্যে আছে সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে। হয় বাড়িটার ঠিকানা মিথ্যে, কিংবা মেয়েটির গল্প মিথ্যে। একদিন বলেওছিলাম তাকে। সে হেসে উড়িয়ে দিলো আমার কথা। কোনো উত্তর দিলো না।

হপ্তার পর হপ্তা কেটে গেল। তারপর একদিন লক্ষ্য করলাম অনিল দিনের পর দিন রোগা আর ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে। তাকে

একদিন বললাম দেখ, যে প্রেম মানুষকে মোটা করে না, সে প্রেম করার কোনো মানে হয় না। শুনে অনিল একটা ফ্যাকাশে হাসি হাসলো, কিচ্ছু বললো না।

আরো কয়েক হপ্তা কেটে গেল। তারপর একদিন জানলাম যে অনিল আমায় কোনো কথাই মিথ্যে বলে নি।

সেদিন এক রোববার সকাল।

বাজারে গেছি চাকরকে সঙ্গে নিয়ে, দেখি বাজারে সবাই আলোচনা করছে একটা অদ্ভুত ব্যাপার নিয়ে। কে এক নাম-না-জানা অল্পবয়েসী ছেলেকে নাকি পাওয়া গেছে নদীর পাড়ে সেই নির্জন বাগানবাড়িতে। একটা দড়ির অবাঞ্ছনীয় প্রান্তে দোদুল্যমান অবস্থায়।

কি জানি কেন বুক কেঁপে উঠলো আমার। তক্ষুনি ছুটলাম সেখানে। গিয়ে দেখি যা আশঙ্কা করেছিলাম তাই।

সে অনিল বোস।

চোখ দুটি চিরকালের মতো মুদিত হ'য়ে গেছে, কিন্তু মুখে একটি পরিতৃপ্তির হাসি।

বাইরের কৌতূহলী জনতার মধ্যে গল্প করছিলো এক বুড়ো। পঞ্চাশ-বছর আগে এ-বাড়িতে থাকতো এক ধনী ব্যক্তি, তার বৌ ছেলেমেয়ে নিয়ে। একদিন সন্ধ্যেবেলা ছেলেটি গেল কলকাতায়। তার পরদিন সকালে ফিরে এসে দেখে তার মা বাপ বোন রক্তাক্ত দেহে পড়ে আছে ঘরের মধ্যে।...সে যুগের সব চেয়ে চাঞ্চল্যকর রহস্য, যার কিনারা পুলিস কোনোদিনই করতে পারে নি।

ছেলেটি চলে গেল কলকাতায়। বাড়ি বিক্রি হয়ে গেল। কিন্তু সেদিন থেকে কেউ আর থাকতো না এ-বাড়িতে। লোকে নাকি ভয় পেতো।

এ গল্প আমি আগে কোনোদিন শুনি নি, হয়তো লিলুয়ায় আমরা নতুন লোক বলেই তখনো কানে আসেনি এ কাহিনী।

"মেয়েটি কি খুব সুন্দর ছিলো দেখতে," আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"হ্যাঁ, ওর রূপের নামডাক ছিলো," বললে বুড়োটি, "আপনি কি করে জানলেন?"

আমি কোনো উত্তর দিলাম না। শুধু ভাবছিলাম ভালোবাসার মধ্যে এমন কি পেলো অনিল যে অল্পবয়েসের এই মিষ্টি জীবনের কোনো মূল্যই রইলো না তার কাছে।

মনে পড়লো, আগের দিন রেস্তরাঁ থেকে বেরোবার সময় অনিল বলেছিলো একটা বহুক্ষণের ফ্যাকাশে নিস্তব্ধতার পর, "একটা কথা কি জানো, ভালোবাসার সার্থকতা এত বেশী যে, মানুষের প্রেম যখন জীবন মৃত্যুর ব্যবধানকে ছাড়িয়ে যায় তখন ভালোবাসার দাম দিতে হয় নিজের জীবন দিয়ে।"

আমি কথাটাকে খুব একটা গুরুত্ব দিই নি। এ ধরনের রোমান্টিক বুকনি কতো শোনা যায়, প্রেমে পড়লে কতো আবোল তাবোল বকে অল্পবয়েসী ছেলেরা!

কিন্তু সেদিন রোববার সকালে অন্য রঙ নিলো অনিলের কথাগুলো, সেসব একটার পর একটা মনে পড়লো, মনে কাঁটা বিঁধিয়ে।"

* * * *

পরিতোষের গল্প শেষ হোলো, সে থামলো, সিগারেট নিভিয়ে রাখলো ছাইদানে।

সবাই চুপচাপ।

বনানীর পাশে বসেছিলো সুজাতা দত্ত নামে এক রূপসী। মানব চরিত্রে অভিজ্ঞতা এবং সার্বজনীন সহানুভূতি আর ব্যাপক সহযোগিতার জন্যে সে খুব জনপ্রিয়া। একটা দীর্ঘ স্তব্ধতার পর সে আস্তে আস্তে বললো, "আমি ভাবছিলুম কি, যদি তার আগে অনিল বোসের সঙ্গে আমার পরিচয় হোতো!—"

অপূর্ব লাহিড়ী এবং তাঁর স্ত্রী মঞ্জু প্রত্যেক বছর তাঁদের বিয়ের তারিখে কয়েকজন বন্ধু বান্ধবীকে নিয়ে পিকনিকে যেতেন। এ উপলক্ষে বাড়িতে চা বা খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন না করে পিকনিক করতেন এজন্যে যে, তাঁদের নাকি প্রথম হৃদয় বিনিময় এবং বিয়ের প্রস্তাবনা হয় কোনো এক পিকনিকে।

এ বছর তাঁদের বিয়ের বাৎসরিকী পড়লো কোনো এক রোববারে। সুতরাং মিসেস মঞ্জু লাহিড়ীর বোন বনানী মৈত্রের বাড়ির সেদিনকার বৈঠক বাতিল করে সবাই গেল পিকনিকে।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর এক সময় বনানী অসিতকে বললো, "জানেন, দিদির এই পিকনিকে গত তিন বছরে তিনটি বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়েছে। গত বছর কান্তি রায়চৌধুরী অমিতার কাছে বিয়ের কথা পেড়েছিলো এই পিকনিকেই। তার ঠিক দু-মাস পরে ওদের বিয়ে হয়।"

"এ বছর কার হবে?" অসিত জিজ্ঞেস করলো।

বনানী একটু হাসলো। তারপর বললো, "বিভূতি একটু আগে আমায় জিজ্ঞেস করছিলো ওই একই কথা।"

বনানীর উপর বিভূতির যে একটু দুর্বলতা আছে এটা অসিত লক্ষ্য করেছিলো অল্পদিনের মধ্যেই। জিজ্ঞেস করলো, "শুধু একথাই জিজ্ঞেস করেছিলো, আর কিছু বলে নি?"

বনানীর কান দুটো একটু লাল হোলো। তবু সহজ ভাবে হেসে বললো, "তাও বলেছে।"

"তাই নাকি? খুব ভালো খবর। পিকনিকের পটভূমিকার ঐতিহ্য তাহলে এবছরও বজায় রইলো।"

"না, তা বোধ হয় রইলো না।"

"কেন ?"

"আমি রাজী হই নি," বলে বনানী চলে গেল। অসিত এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলো। বিভূতি দত্তকে দেখতে পেলো একটু দূরে।

মুখ ভার করে একটি গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে আছে।"

পিকনিক থেকে ফেরার পথে শহরতলির যে অঞ্চল দিয়ে ওদের বাস আসছিলো সেটি তখনো ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের গঠন পরিকল্পনার প্রথম ধাপ ছাড়িয়ে উঠতে পারে নি। দু-চারটে বাড়ি উঠেছে এদিক ওদিক, বেশির ভাগই অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে। পথটা চওড়া, কিন্তু একেবারে নির্জন, চলাচল-বিহীন।

সন্ধ্যে হয়ে একটু শীত-শীত করছে তখন। মহিলারা ঠাণ্ডায় শিরশিরিয়ে উঠলো মাঝে মাঝে। পুরুষেরা সিগারেট টেনে চললো একটার পর একটা।

আর সবাই মিলে রসালো পরচর্চা আর গল্প।

এর ওর তার আলোচনা করতে করতে শেষ পর্যন্ত যার কথা সবাই বেশী করে বলতে শুরু করলো, তার নাম রাণা গুহ, যাকে এই কদিন দেখাই যাচ্ছিলো না কোথাও। অত্যন্ত স্মার্ট, বেশ সুন্দর দেখতে রাণা গুহ নামে এই ছেলেটি, চেহারায় চলাফেরায় বেশ একটা উৎসাহী অমিত-রায়-অমিত-রায় ভাব, যাকে নাকি অত্যন্ত পছন্দ করতো মেয়েরা, আর অত্যন্ত অপছন্দ করতো ছেলেরা। যে কোনো কারো স্বপ্নের রাজকুমার হওয়ার জন্যে যা কিছু দরকার সবই ছিলো তার মধ্যে, আর এ সুযোগের সদ্ব্যবহার সে সব সময়ই করতো পুরোমাত্রায়, যা অত্যন্ত অসুবিধে ঘটাতো বিবাহিত পুরুষদের, আর গাত্রদাহের কারণ ঘটাতো অবিবাহিত পুরুষদের। তবু তাকে খুব পছন্দ করতো

সবাই, কারণ এই নিষ্ঠুর পৃথিবীতে সবাই অন্য অভাগার অসুবিধের হাস্যরস উপভোগ করতে ভালোবাসে।

সুতরাং একদিন যখন দেখা গেল এ হেন দের বিষবৎ এড়িয়ে চলছে আর শেষ পর্যন্ত একদিন বি একটি অত্যন্ত কুৎসিত মেয়েকে, তখন একটা ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লো পরিচিত মহলে। রূপসীরা র বিরক্তিতে আগুন হয়ে গেল, আর পুরুষেরা মজা পেয়ে গেল সবাই।

"এ ধরনের ছেলেদের শেষ পরিণতি এ-রকমই হয়" বললো দর্শনে অধ্যাপক সিদ্ধার্থ বোস।

মীনা সেন নামে একজন বসেছিলো বিভূতি দত্তের পাশে। সে অনেক বেশী প্র্যাকটিক্যাল মেয়ে। বললো, "তার চেয়ে সে গলায় দড়ি দিলো না কেন? ওর মেমোরিয়্যাল ফাণ্ডে টাকা দিতে আমরা কেউ পেছপা হতাম না। তাতে ক্লাবের টেনিস-টুর্নামেণ্টের জন্যে একটা ভালো ট্রফি হোতো। এমন চমৎকার টেনিস খেলতো এই রাণা ছেলেটি!"

"খেলতো নয়, এখনো খেলে," বলে উঠলো বিভূতি দত্ত।

"আমার কাছে সে মারা গেছে বলেই ধরে নাও," উত্তর দিলো মীনা সেন। "আমার কাছে ওর কোনো অস্তিত্বই আর নেই।"

"ছিলো কী কোনোকালে," জিজ্ঞেস করলো অপূর্ব লাহিড়ীর স্ত্রী মঞ্জু। মীনা সেনের সঙ্গে মঞ্জুর খুব বনিবনাও ছিলো না একথা সবাই জানতো। মেয়েদের ব্যাপার, কেউ মাথা ঘামায় নি এর কারণ নিয়ে। কারণটা জানলেও বোধ হয় আলোচনা করতো না।

"আমি ধরে নিয়েছি রাণা আর বেঁচে নেই, সে মারা গেছে," বললো মীনা সেন।

"আমার কি মনে হয় জানো," বললো অমরেশ গুপ্ত, "নিশ্চয়ই কোনো একটা বিশেষ কারণ ঘটেছে, যার জন্যে সে এরকম করলো।"

"যদি কোনো বিশেষ কারণ থাকে," মীনা সেন বললো, "সে এমন একটা বিশেষ কারণ যেটা কোন মহিলার আলোচনা করা উচিত নয়।"

"কেন? তোমাদের কি একথা মনে হয় না যে কোনো মানসিক আঘাত পেয়ে রাণা গুহের রুচি বদলে গেছে? এ-রকম তো প্রায়ই হয়," বললো কান্তি রায়চৌধুরী।

অপূর্ব লাহিড়ী বসেছিলো চুপচাপ। কোনো কথা বলে নি এতক্ষণ। এবার প্রথম মুখ খুললো।

"কান্তি ঠিকই বলেছে," বললো সে, "ওর ব্যাপারটা আমি জানি খানিকটা। আসলে কান্তি যা বললো, ও-রকমই একটা ব্যাপার হয়েছে। একটা সাংঘাতিক শক পেয়েছে সে। ও কি করে সেটা সহ্য করলো জানি না। অন্য কেউ হলে পাগলগারদে পড়ে থাকতো।"

সবাই তখন অপূর্ব লাহিড়ীকে ধরে পড়লো কাহিনীটা বলবার জন্যে। সবাই নিশ্চিত যে এ আর একটা রসালো ব্যাপার। কারণ রাণার জীবনে কোনো সাধারণ ঘটনা ঘটতো না, যা ঘটতো সে চিরকালই একটা রসালো কাহিনী।

"সবুর করো দু'মিনিট। তারপর বলছি," বললো অপূর্ব লাহিড়ী।

কেউ কোনো কথা বললো না গল্প আরম্ভ হওয়ার প্রত্যাশায়। বাস এগিয়ে চললো নির্জন পথ ধরে। কিছুক্ষণ পর একটু দূরে একটা অন্ধকার ভিলা দেখিয়ে লাহিড়ী জিজ্ঞেস করলো, "ওটা কার বাড়ি জানো?" সবাই ঘাড় নাড়লো।

"অমল মুখার্জীর। নিশ্চয়ই শুনছো ওর নাম।"

"কোন অমল মুখার্জী? সেই লক্ষপতি অমল মুখার্জী যে কয়েকটা কলিয়ারির মালিক?"

"হ্যা।"

"ওর বৌ তো খুব নামকরা সুন্দরী ছিলো, তাই না," সিদ্ধার্থ বোস জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যাঁ। তাইতো শুনেছিলাম," বললো অপূর্ব লাহিড়ী। গাড়ি এগিয়ে চললো মাঝামাঝি গতিতে। "এদিকে খুব কম লোকই চিনতো তাদের। কারণ ওরা কলকাতায় থাকতো না বড়ো একটা। এই মিসেস মমতা মুখার্জী ছিলেন মুখুজ্যে মশায়ের চতুর্থ পক্ষের স্ত্রী। বেশ বুড়ো হয়ে গিয়েছিলো অমল মুখার্জী। ডিসপেপসিয়ায় ভুগছিলো বহুদিন ধরে। বছরের বেশির ভাগ সময় সে দার্জিলিং, সিমলা, শিলং, দেরাদুন করেই বেড়াতো।"

"ওদের সম্বন্ধে আমি শেষবার শুনেছিলাম আমি যখন বোম্বেতে," বললো সিদ্ধার্থ বোস। "ওরাও বোম্বে ছিলো তখন। সে সাত-আট বছর আগেরকার কথা। আমি যদ্দুর জানি ওরা এখনো কলকাতায় ফেরেনি।"

"আর ফিরবেও না," বললো অপূর্ব লাহিড়ী।

"মানে ?"

"মনে হচ্ছে তোমরা শোনো নি। তোমাদের শোনার কথাও নয়। টাকা ঢালা হয়েছিলো জলের মতো। একেবারে চেপে দেওয়া হয়েছিলো খবরটা। ব্যাপারটা হয়েছিলো এই সেদিন, কিন্তু হঠাৎ শেয়ালদায় এসে ভিড় জমাতে সুরু করা রিফিউজীদের খবরের ভিড়ে ওদের খবর আর জায়গা পেলো না।"

"কেন ? কি হয়েছিলো ?"

"হয়েছিলো বেশ একটা গুরুতর ব্যাপার। মমতা মুখার্জী বুকে ছুরি বসিয়ে খুন করেছিলো অমল মুখার্জীকে। সে ভেবেছিলো ব্যাপারটা এমন ভাবে সাজাতে পারবে যাতে পুলিশ মনে করে কোনো চোর বা গুণ্ডা জানলা ভেঙে ঘরে ঢুকে খুন করেছে বুড়োকে। কিন্তু যখন দেখলো সে যা ভেবেছিলো তার চেয়ে অনেক বেশী প্রমাণ

আছে পুলিশের হাতে, তখন শেষ পর্যন্ত গুলি করে নিজের মাথার খুলি উড়িয়ে দিলো মমতা মুখার্জী।”

“ইশ, কী সাংঘাতিক মেয়ে বাবা,” বললো মিসেস লাহিড়ী।

বিরক্ত হয়ে উঠেছিলো মীনা সেন। “তা' রাণা গুহের সঙ্গে এ ব্যাপারের কী সম্পর্ক,” জিজ্ঞেস করলো সে।

“কিচ্ছু না,” বললো অপূর্ব, “ওদের কথা উঠলো বলে ওদের এই খবরটাও বললাম। কিন্তু আমি যা বলতে যাচ্ছিলাম সে হোলো মমতা মুখার্জীই শেষ সুন্দরী মেয়ে যার সঙ্গে রাণা গুহ একটু প্রেম করেছে।”

“রাণা গুহের শেষ প্রেম!” বললো মীনা সেন, “বেশ ইন্টারেসটিং ব্যাপার মনে হচ্ছে!”

“সত্যিই বেশ বৈচিত্র্যময়,” বললো লাহিড়ী, “আমি রাণার মুখেই শুনেছি ব্যাপারটা। সে খুব এলোমেলো ভাবেই বলেছে। আমি তোমাদের বলছি সবটা ভালো করে গুছিয়ে—

সে এক শনিবার রাত্রি।

রাণা গুহের পেটে সেদিন কয়েক গ্যালন হুইস্কি আর সোডা পড়েছে। তখন ক্লাবের নাচ আর হুল্লোড় আর হট্টগোল অত্যন্ত অসহ্য মনে হোলো তার স্নায়ুর পক্ষে। তার মনে হোলো, আর নয়, অনেক হয়েছে, এবার জীবনে শান্তি চাই, নির্জনতা চাই, আর সত্যিকারের কামগন্ধহীন পবিত্র প্রেম চাই। এবং সে রজকিনী হলেও আপত্তি নেই।

সুতরাং সে বেরিয়ে এলো ক্লাব থেকে, চড়ে বসলো গাড়ির ভেতর, চালিয়ে দিলো গাড়ি, চালিয়ে দিলো যেন সে অনির্দেশের পথে চলেছে তার চিরন্তন প্রিয়তমার সন্ধানে, তাকে খুঁজে বার করতে। এলোমেলো ঘুরে বেড়ালো ময়দানে আর তারপর ভাবলো,

নাঃ, প্রিয়তমারা তো পথের পাশে ঘাসের ফুলের মতো গজায় না যে রাণা গুহ এসে চয়ন করে নেবে। সে গাড়ি ঘুরিয়ে নিলো লোয়ার সার্কুলার রোডে আর ভাবলো, এবার বাড়ি ফেরা যাক।

কিন্তু বাড়ি ফেরা হোলো না।

পথে ঠিক হরিশ মুখার্জী রোড আর সার্কুলার রোডের মোড়ে রাণা দেখলো একটি ভদ্রমহিলা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। সে একটু উৎসুক হোলো, কারণ মহিলারা শহরের এ অঞ্চলে একা দাঁড়িয়ে থাকেনা। সে গাড়ির গতি কমিয়ে আনলো। কাছাকাছি আসতেই দেখলো মহিলাটি অপরূপ সুন্দরী। তার পোশাক আর চেহারার গাম্ভীর্যে বুঝলো যে এ নিশ্চয়ই খুব সম্রান্ত পরিবারের মেয়ে। সে গাড়ি থামালো আর পরোপকারী ক্ষত্রিয় বীরের মতো জিজ্ঞেস করলো, কী ব্যাপার। কোনো অসুবিধায় পড়েছেন নাকি? আপনার কী উপকারে লাগতে পারি বলুন।

"কিছু না, ধন্যবাদ।" বললো মেয়েটি, "আমি ট্যাক্সির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি।"

রাণা তাকে বললো যে, "এ সময় ট্যাক্সি পাওয়া শক্ত। পেলেও ট্যাক্সিতে একা যাওয়া কোনো ভদ্রমহিলার পক্ষে নিরাপদ নয়। আমারই গাড়িতে আসুন," সে বললো মেয়েটিকে।

প্রথমটা সে কিছুতেই রাজী নয়। কিন্তু রাণা ছাড়বেনা। শেষ পর্যন্ত একটু ইতস্তত করে সে উঠে পড়লো ওর গাড়িতে।

ঠিকানাটি বলে দিলো রাণাকে। রাণা গাড়ি ঘুরিয়ে নিলো।

রাণা এমনি বেশ মিশুক ছেলে। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে জমিয়ে নিতে পারে যে কোনো লোকের সঙ্গে। কয়েক মিনিটের মধ্যে সে বেশ আলাপ জমিয়ে ফেললো, তারপর রীতিমত বন্ধুত্বই পাতিয়ে ফেললো, কারণ জানোই তোমরা যে রাণার সঙ্গে আলাপ হলে পরে ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব না পাতিয়ে থাকা অসম্ভব

করে তোলে সে। তারপর কথায় কথায় রাণা বার করে ফেললো যে মেয়েটি ধনকুবের অমল মুখুজ্যের বৌ। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে তার মাথায় নতুন আইডিয়া খেলতে লাগলো।

সে তাকে জিজ্ঞেস করলো না যে সে কোথেকে আসছে আর সে এত রাত্তিরে কেনই বা একা দাঁড়িয়ে ছিলো পথের পাশে, ট্যাক্সির অপেক্ষায়। তার আবছা মনে পড়লো—একে সে যেন আগেও নানা জায়গায় দেখেছে। আর তার যদ্দুর মনে পড়ে সে কিছুদিন আগে কার কাছে যেন শুনেওছিলো যে তার স্বামী তার সঙ্গে বেরুতো না বড় একটা। স্বামীর সঙ্গে এমন কিছু নিবিড় সম্পর্ক বড় একটা ছিলো না। সে তার নিজের একটা আলাদা জীবন গড়ে তুলেছিলো।

বেশ একটা আদর্শ পরিস্থিতি, ভাবলো রাণা। বেশ বুঝতেই পারছো যে এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার একটা মতলব তার মাথায় ঘুরছিলো।

ওর বাড়ি পৌঁছুতে সে ভাবলো কি করে এর সঙ্গে আরো কিছু সময় কাটানো যায়। কিন্তু বিস্ময়টা মেয়েটিই দিলো তাকে।

"আপনাকে ধন্যবাদ জানানোর ভাষা পাচ্ছি না," মেয়েটি বললো, "আপনি আমার জন্যে এতটা কষ্ট করলেন। ভেতরে আসুন না। এক কাপ কফি খেয়ে যাবেন। অবশ্যি যদি আপনার বেদম ঘুম না পেয়ে থাকে।"

রাণাকে আর বেশী কিছু বলার প্রয়োজন হোলো না। গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে সে মমতা মুখার্জীর অনুগমন করলো।

বাগানের ভেতর দিয়ে একটা সরু পথ ধরে এগিয়ে ওরা এক পাশে একটা ছোটো দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো। মেয়েটি বললো যে, সে চায় না তার চাকর বাকর এত রাত অবধি জেগে থাকুক

সামনের সদর দরজাটা খুলে দিতে। তাই সে পাশের দরজার একটি ল্যাচ্-কী নিয়েই বেরুতো।

সে দরজা খুলে রাণাকে নিয়ে বসালো একটি ছোটো সুন্দর সাজানো বসবার ঘরে।

তারপর রাণা প্রথম অনুভব করলো, সমস্ত ব্যাপারটা একটু কি রকম যেন ঠেকছে। বাড়িটা এত অন্ধকার আর এত নিঃশব্দ যে, মনে হয় না এখানে কেউ আছে। বসবার ঘরের আবহাওয়াটা বড়ো গুমোট, আর ধুলো জমে আছে এখানে সেখানে। আলো নেই সে ঘরে,—শুধু এক কোণে একটি নীল আলো ছাড়া। এক পাশে একটি ছোটো বার্, পেছনে একটি বিরাট আয়না। বারে একটি বোতলেও কিছু নেই এক ফোঁটাও। সব খালি।

এরকম পয়সাওয়ালা লোকের বৌ, রাণা ভাবলো, সে গাড়ি নিয়ে বেরোয়নি কেন? কে জানে হয়তো গাড়ি খারাপ হয়ে আছে। কিন্তু মেয়েটির নিশ্চয়ই খুব সাহস আর নিশ্চয়ই যথেষ্ট আস্কারা পায় স্বামীর কাছ থেকে। তা নইলে সে কি করে একলা রাতে পাশের দরজা চাবি দিয়ে খুলে ঢোকে আর কেউ কোনো প্রশ্ন করবার জন্যে নেমে আসে না। যাক সে, কি আসে যায় তাতে, রাণা ভাবলো। তার রক্তে আগুন জ্বলে উঠেছে, সে শুধু জানলো সে কি চায়, আর ভাবতে লাগলো সে কি করে পাওয়া যায়। এই আবহাওয়ায় যদি তার সুবিধে না হয় তো আর কিসে হবে। সুতরাং মেয়েটির অদ্ভুত স্বভাব সম্বন্ধে ভেবে কী লাভ।

মেয়েটি চলে গিয়েছিলো তার জন্যে কফির ব্যবস্থা করতে। ফিরে এসে বললো, রাণা যেন কিছু মনে না করে। চাকরবাকর সবাই ঘুমোচ্ছে। গরম জল যোগাড় করা গেল না।

ওরা গল্প করলো কিছুক্ষণ। তারপর রাণা ভাবলো, তার প্রয়োজনের আরম্ভের পক্ষে এ যথেষ্ট হয়েছে। বেশী তাড়াহুড়ো করলে কাজ হবে

না। আজকের মতো মুলতুবী রাখা যাক। কাল দেখা যাবে। সে উঠে পড়লো।

"আপনি যাবেনই," জিজ্ঞেস করলো মেয়েটি।

রাণা তাকালো মেয়েটির চোখের দিকে। মনে হোলো কি যেন আছে মেয়েটির চোখে যার দরুণ মেয়েটিকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করলো না তার। কিংবা হয়তো রাণার চোখেই কি যেন দেখলো মেয়েটি যার দরুন রাণাকে যেতে দিতে চাইলো না সে।

জানোই তো, রাণার মাথায় কিছু ঢুকলে তাকে ঠেকানো অসম্ভব। সময় আর এগুলো না যেন। রাতটি নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে গেল সে ঘরে। ওরা দুজনে মিষ্টি মিষ্টি কথা শোনালো দু'জনকে, আর তার সঙ্গে মিশিয়ে দিলো আনুষঙ্গিক আদর দেখানো।

"রাণা," বললো মমতা মুখার্জী, "কে ভেবেছিলো তুমি আমার জীবনে এসে পড়বে।" ওরা চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর মমতা বললো, "রাণা, আমার স্বামী যে এখনো বেঁচে আছে।"

"কী আসে যায় তাতে," রাণা বললো ডন জুয়ানের মতো।

"আমি পুরোপুরি তোমার হতে চাই," বললো মমতা। তারপর একটু চুপ করে থেকে বললো, "আচ্ছা মনে করো, আমি যদি কোনো উপায় করতে পারি ?"

রাণা একটু অসোয়াস্তি বোধ করলো। চিরকালের জন্যে কেউ তার পুরোপুরি একলার হবে এটা তার জীবনদর্শন নয়। একটি বড়ো অয়েল পেন্টিং দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "উনিই কি তোমার স্বামী ?"

"হ্যাঁ," বললো মমতা, "একটি জানোয়ার! আমার জীবনটা একেবারে নষ্ট করে দিয়েছে। কিন্তু তুমি আমার কথা শুনছো না কেন ? বলছিলুম, আমি যদি কোনো উপায় করতে পারি ?"

"কী উপায় ?"

"যদি মেরে ফেলি আমার স্বামীকে ?"

রাণা হাসলো। প্রেমে পড়লে মেয়েরাও এত বোকার মত এত অসোয়াস্তিকর সেন্টিমেন্ট্যাল কথাবার্তা বলতে পারে!

"না, না, পাগল, ওরকম করতে আছে? ওসব ভেবো না। তোমার স্বামীকে ওঁর মতো থাকতে দাও, আর আমরা আমাদের মতো থাকবো।"

একথা কাণে গেল না মমতার। বলে চললো, "যদি আমি ওকে খুন করি, তুমি লাশ গুম করে ফেলতে পারবে, যাতে কেউ জানতে না পারে?"

"কী পাগলের মতো কথা বলছো, ডার্লিং," বললো রাণা তাকে আরো নিবিড় ভাবে কাছে টেনে। "এসব মরবিড অসম্ভব কথা ভেবে লাভ নেই। এসো, মিষ্টি কিছু আলোচনা করা যাক।"

"রাণা, ডার্লিং," বললো মমতা, আর মুখ লুকালো রাণার বুকে। রাণা তাকে চেপে ধরে সামনের দিকে তাকালো। সঙ্গে সঙ্গে চোখ পড়লো সামনের বড়ো আয়নায়। আর যা দেখলো তাতে তার রক্ত জমে হিম হয়ে গেল।

আয়নার ভেতর দেখলো, সে যাকে বুকে চেপে ধরেছে সে তো সুন্দর দেহগঠনের একটি ফর্সা মেয়ে নয়। সে একটি কঙ্কাল, যার আঙুলগুলো রাণার চুলের ভেতর নড়ছে আর যার মাথার খুলি সে চেপে আছে তার বুকে।

আর তাদের পেছনে একটি মোটা হাত দরজার পর্দাটা তুলছে।

পর মুহূর্তে যে ঘরে ঢুকলো তার চেহারার সঙ্গে অয়েল পেন্টিংএর চেহারার সম্পূর্ণ মিল, সে মমতার স্বামী। টলতে টলতে এসে ঘরে ঢুকলো সে। তার চোখ দুটো ঘোলাটে, মুখ ফ্যাকাশে। সে টলতে টলতে এসে সোফার উপর ঢলে পড়লো, পড়ে গেল উপুড় হয়ে। একটি ছুরি আমূল বসিয়ে দেওয়া তার পিঠে। রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়ছে।

এ সব সে কিন্তু দেখলো আয়নার ভিতর।

সে মুখ ফিরিয়ে দেখলো—সে তেমনি জড়িয়ে ধরে আছে একটি সুন্দর মেয়েকে। অনুভব করে দেখলো, নাঃ এতো রক্তমাংসের শরীর। মাথাটা ঝাঁকালো সে। বড্ড মাথা ধরেছে। হুইস্কিটা আজ বড্ড বেশী হয়ে গেছে যেন।

সে আবার মুখ তুললো। দেখলো, আরে, আয়নায় তো আবার অন্যরকম দৃশ্য। একটি লাশ পড়ে আছে পেছনের সোফায়। আর তার বাহুবন্ধনে একটি কঙ্কাল।

সে চট করে ঘুরে দাঁড়ালো মমতাকে ছেড়ে দিয়ে। মনের কোণে আশা ছিলো, এ হয়তো চোখের ভুল, নিশ্চয়ই কোথাও কিছু নেই ঘরের ভিতর।

"কি হোলো," জিজ্ঞেস করলো মমতা।

কিন্তু, একি, একটি লাশ সত্যি সত্যিই যে সোফার উপর—পিঠে ছুরি বেঁধানো, রক্তের ধারা শুকিয়ে গেছে।

ঠক ঠক করে কাঁপতে শুরু করলো রাণা। "একি," চেঁচিয়ে উঠলো সে।

একটি হাল্কা হাসি শুনতে পেলো। "উনি আমার স্বামী," পেছন থেকে বললো মমতা, "খুন করেছি ওকে।"

পরকীয়া প্রেম সম্বন্ধে রাণার ধারণা আর যাই হোক এরকম নয়। "কি বললে?" সে ফিরে দাঁড়ালো, আর দাঁড়ালো একেবারে একটি সাদা ধপধপে কঙ্কালের মুখোমুখি, যার গায়ে চমৎকার সিল্কের শাড়ি, আর ব্রোকেড করা ব্যাগ ঝুলছে আঙুলের হাড় থেকে।

রাণা আর এক সেকেণ্ডও অপেক্ষা করলো না। সে ছুটে বেরিয়ে পড়লো ঘর থেকে, সিংহের তাড়া খাওয়া হরিণের থেকেও দ্রুত, হরণ করে নেওয়া বৌকে উদ্ধার করতে ছোটা বেদুইন ঘোড়সোয়ারের ঘোড়ার চাইতেও দ্রুত।

পেছন থেকে মমতার গলা শুনলো সে। তাকে ফিরে যেতে ডাকছে। সে থামলো না। বাগান পেরিয়ে এক লাফে উঠে পড়লো গাড়িতে। স্টার্ট দিতে দিতে শুনতে পেলো বাড়ির ভেতর একটি রিভলভারের গুলির আওয়াজ।

এর বেশী আর ও-বাড়ি সম্বন্ধে কিছু মনে নেই রাণার।

"পুরো একমাস নার্ভাস ব্রেক ডাউনে ভুগলো রাণা," অপূর্ব লাহিড়ী বলে চললো। "কোনো সুন্দরী মেয়ে আর সহ্য করতে পারতো না সে। সে ছিলো এক বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানীর তত্ত্বাবধানে। সে বললো, রাণা সেরে উঠবে, সে যদি কোনো কুৎসিত মেয়েকে বিয়ে করে তাহলে। সুতরাং রাণার মা-বাপ দেশময় খোঁজাখুজি করে সবচেয়ে কুৎসিত মেয়ে এনে বিয়ে দিলো রাণার সঙ্গে।

রাণা এখন সেরে উঠেছে, বেশ আছে, সুখেই আছে। শুধু একটি অবসেশান তার। কোনো সুন্দর মেয়ে সে সহ্য করতে পারে না। সুতরাং আমরাও নিশ্চিন্ত আছি। আক্ষেপ বা অভিযোগ করবার কিছু নেই।"

গাড়িতে আমরা সবাই শীতে শিরশির করতে করতে জড়োসড়ো হয়ে বসলাম।

মীনা সেন জিজ্ঞেস করলো, "তার মানে, আপনি বলতে চান, ওর সঙ্গে রাণার দেখা হওয়ার আগেই ওরা মারা গিয়েছিলো।"

"হ্যাঁ।"

"তার মানে, যার সঙ্গে রাণা প্রেম করলো সে একটা······না, না, সে হতে পারে না।"

"হতেও পারে বা নাও হতে পারে," অপূর্ব বললো, "মনোবিজ্ঞানীর মতে রাণা হয়তো আগে কোনো রকমে জেনেছিলো

বোম্বেতে ওদের ট্র্যাজেডির খবর। তারপর সে রাত্তিরে প্রচুর মদ খেয়ে মাতাল অবস্থায় হয়তো এরকম আবোল তাবোল কল্পনা করেছে। যাই হোক, আমি শুধু উৎসুক ছিলাম, সে কেন সুন্দর মেয়ে এড়িয়ে কুৎসিত মেয়ে বিয়ে করলো। সেটা জেনেই আমি খুশি।"

"কিন্তু সেই সাইকলজিস্ট যা বললো, সে কি সম্ভব," জিজ্ঞেস করলো সিদ্ধার্থ বোস।

"আমার মনে হয়, সম্ভব হয়তো নয়। কারণ মুখার্জী-দম্পতির ট্র্যাজেডিটা হয়েছিলো বোম্বেতে আর কলকাতায় সে খবর একেবারে চেপে যাওয়া হয়েছিলো। তবে কোনো কিছু সম্বন্ধে কিছুই নিশ্চিত হয়ে বলা যায় না, কারণ মরে যাওয়ার পরের অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এত কম।"

অনেকক্ষণ পর কথা বললো মিসেস মঞ্জু লাহিড়ী। "এতক্ষণে বুঝলাম," সে বললো।

"কি বুঝলে," জিজ্ঞেস করলো ওর স্বামী।

"কিছুদিন আগে রাণার সঙ্গে দেখা হয়েছিলো। সবাই আজকাল ওকে যা জিজ্ঞেস করছে, সেটা জিজ্ঞেস করতেই রাণা আস্তে আস্তে বললো, ইংরেজিতে একটা কথা আছে জানো, beauty is only skin deep,—সৌন্দর্য, রূপ সবই শুধু চামড়ার উপরই। আমি অনেক ভুগে একথার সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়েছি।"

একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপলো মিসেস লাহিড়ী। সবাই চুপ করে রইলো। সবারই মনে পড়লো যে, সুন্দরী মহিলা বলে খ্যাতি আছে মিসেস লাহিড়ীর।

একদিন রোববার সন্ধ্যেবেলা অসিত চ্যাটার্জী বনানী মৈত্রের বাড়ি উপস্থিত হতেই বিভূতি দত্ত তাকে একপাশে ডেকে নিয়ে

বললো, "কাল আপনি কলেজে যাননি? আমি বার-দুই আপনাদের ডিপার্টমেণ্টে টেলিফোন করেছিলাম।"

"তাই নাকি?" অসিত বললো, "আমার শরীর খারাপ ছিলো বলে বাড়িতেই ছিলাম সারাদিন। বাড়িতে এলেই পারতেন।"

"বাড়িতেও গিয়েছিলাম।"

"তাই নাকি? কেউ তো বলেনি আমায়। ও হ্যাঁ, একবার বেরিয়েছিলাম। ডিসপেন্সারিতে গিয়েছিলাম কার্মিনেটিভ মিক্সচার কিনতে।"

বিভূতি দত্ত একটা অদ্ভুত হাসি হাসলো। বললো, "হয়তো গিয়েছিলেন। আমি সে খবর জানতাম না। আমি শুধু এটুকু জানি যে, সারা দুপুর আপনি নানকিং-এ ছিলেন। খুব মনের সুখে ফ্রাইড রাইস চপ-সুয়ে উড়িয়েছেন।"

অসিতের কান দুটো একটু লাল হোলো। জিজ্ঞেস করলো, "আপনিও নানকিং-এ গিয়েছিলেন বুঝি? আমাদের সঙ্গে এসে বসলেই পারতেন।"

"ইচ্ছে করেই যাইনি। আপনি আর বনানী দুজনে মিলে খুব গল্প করছিলেন, তাই আমি আর মাঝখানে গিয়ে পড়তে চাইলাম না।"

অসিত কোনো উত্তর দিলো না।

বিভূতি অসিতের পিঠ চাপড়ে বললো, "ব্রাদার, অতো লাল হয়ে যাচ্ছেন কেন? লুকিয়ে যে কাজই করুন না কেন, সংসারে দু'রকম লোকের চোখে ধুলো দেওয়া যায়না। এক হচ্ছে—পুলিস। আর অন্য একটি হোলো—খবরের কাগজের রিপোর্টার।"

আরেকজন ভদ্রলোক বিভূতির শেষ কথাগুলো শুনতে পেয়েছিলেন। তিনি একটু হেসে বললেন, "এ কিন্তু সব সময় পুলিস বা রিপোর্টারের ব্যক্তিগত কেরামতি নয়। কি করে যেন জানাজানি হয়ে যায়।"

ভদ্রলোকের সঙ্গে এদের আলাপ করিয়ে দিলেন অপূর্ব লাহিড়ী। তিনি রোববারের আসরের একজন নবাগত অতিথি, এই প্রথম আসছেন। ভদ্রলোকের নাম পূর্ণাংশু গুহ, কলকাতা পুলিসের একজন নতুন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার। অল্প কিছুদিন হোলো মফস্বল থেকে বদলি হয়ে এসেছেন। অপূর্ব লাহিড়ীর সঙ্গে অনেকদিনের চেনা। তাঁর মুখে যখন একদিন শুনলেন তাঁর স্ত্রীর সহোদরার বাড়িতে প্রত্যেক রোববার সন্ধ্যেবেলা চায়ের আসর বসে আর মাঝে মাঝে বসে নৈশভোজের আসর এবং সেখানে শুধু আলোচনা হয় বিভিন্ন ব্যক্তির অবাস্তব, অলৌকিক এবং অনৈসর্গিক অভিজ্ঞতার, পূর্ণাংশু গুহ খুব আগ্রহান্বিত হলেন এবং জানতে চাইলেন এই আসরে একজন পুলিস-কর্মচারীর উপস্থিতিতে বনানী মৈত্রের আগ্রহ আছে কিনা। সুতরাং এ রোববার তাঁকে যথাবিহিত আমন্ত্রণ জানানো হোলো।

সেদিন সেন মশাই সবাইকে একটা মজার ঘটনা শোনালেন। কোথায় নাকি একটা ভূত দেখা গিয়েছিলো, যে তার নিজের মুণ্ডু ঘাড় থেকে নামিয়ে নিজের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ এবং তর্জনীর মধ্যে আলগোছে ধরে ঘুরে বেড়াতো—যেমনি করে স্মার্ট ছেলেরা ঘুরে বেড়ায় সিগারেটের টিন ধরে। গল্প সমাপ্ত হওয়ার পর মহিলাদের ও-ও-বা-বা-গো বলে একটুখানি শিউরে ওঠা এবং ভদ্রলোকদের চোখ-ঠিকরে-পড়া সামলে নিয়ে সিগারেটে খুব জোরে জোরে টান দেওয়ার পালা যখন শেষ হোলো, বনানী মৈত্র লক্ষ্য করলো যে ঠোঁটের কোণে একটুখানি বাঁকা হাসি নিয়ে পূর্ণাংশু গুহ চুপচাপ বসে আছে।

"পূর্ণাংশুবাবু নিশ্চয়ই এ ধরনের আজে-বাজে গল্প বিশ্বাস করতে চান না," বললো বনানী।

"এসব শুনতে প্রায়ই মন্দ লাগে না," উত্তর দিলো পূর্ণাংশু গুহ।

অমরেশ গুপ্ত বলে উঠলেন, "পুলিসের লোক হয়ে উনি কী করে ভূত বিশ্বাস করবেন? ভূতের সঙ্গে ওঁদের মোলাকাত কোনোদিনই

হয়না। আমি যদ্দুর জানি, অশরীরী মহাপ্রভুরা পুলিসকে যতো সম্ভব এড়িয়ে চলে।"

"কেন, আপনি কোনোদিন ভূত দেখেননি পূর্ণাংশুবাবু," জিজ্ঞেস করলো মঞ্জু লাহিড়ী। "আমার ধারণা ছিলো পুলিস অফিসারদের জীবনে অ্যাডভেঞ্চার, রোমাঞ্চ, এসব প্রচুর পরিমাণে হয়।"

পূর্ণাংশু গুহ একটু হাসলো। তারপর উত্তর দিলো, "এক একজন পুলিস অফিসারের জীবন কতো শান্তিময় আর একঘেয়ে হতে পারে আপনারা ভাবতেও পারবেন না। গোয়েন্দা-কাহিনীর পুলিস অফিসার গল্পের বইয়ের পাতাতেই পাওয়া যায়, সত্যিকারের জীবনে নয়।" বলে একটু থামলো। তারপর আস্তে আস্তে বললো, "তবে একথা সত্যি যে আমি কোনোদিন ভূত-টুত দেখিনি, কেউ দেখেছে কিনা জানিনা, সত্যি সত্যি বিশ্বাসও করিনা—কিন্তু—কিন্তু একবার কোনো একটা কেসের তদন্ত করতে গিয়ে যে ভাবে রহস্যের কিনারা করতে পেরেছিলাম, সেটা অনৈসর্গিক ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। কী ভাবে যে ঘটনাটা ঘটলো সেটা আমি আজো ঠিকমতো যুক্তি দিয়ে বুঝে উঠতে পারি না। তবে এমনি ঘটনাটা খুবই সামান্য, খুবই সাধারণ। তার মধ্যে এমন কিছু নেই যা আপনারা খুব আগ্রহ করে শুনতে চাইবেন, কারণ আপনারা তো এইমাত্র তার চাইতে অনেক বেশী ভয়াবহ, রোমাঞ্চকর গল্প শুনলেন এমন একটি বিদেহী আত্মার সম্বন্ধে যে তার নিজের মুণ্ডু সিগারেটের টিনের মতো হাতে নিয়ে বেড়ায়।"

শ্রোতারা একবাক্যে প্রতিবাদ জানালো। কেউ পূর্ণাংশুর সঙ্গে একমত হোলো না। সবাই বার বার বলতে লাগলো যে পুলিস অফিসারের মুখে শোনা অবাস্তব অভিজ্ঞতার কাহিনী তাদের বিশেষ ভাবে ভালো লাগবে।

সুতরাং পূর্ণাংশু গুহকে তার অকারণ বিনয় পরিত্যাগ করে সবাইকে তার অভিজ্ঞতার গল্প বলতে হোলো।

ঘটনাটা ঘটেছিলো বছর দশ আগে—বলতে শুরু করলো পূর্ণাংশু গুহ। আমি তখন সবে বেঙ্গল পুলিসে যোগ দিয়েছি এবং একটি থানার ও-সি হয়ে গেছি কোন্নগরে।

একদিন আমাদের কাছে রিপোর্ট করা হোলো যে কাশী দে নামে এক ভদ্রলোক নিখোঁজ হয়েছেন। ভদ্রলোক খুব ধনী জমিদার, নদীর ধারে একটি ভিলায় তাঁর ভায়ের সঙ্গে থাকতেন। তিনি বিপত্নীক এবং ছেলেমেয়ে ছিলো না। তাঁর ছোটো ভাই বৃন্দাবন দে-র একটু নাম ছিলো বৈজ্ঞানিক হিসেবে। তিনিও সম্প্রতি সরকারী চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করে সেই ভিলাতে একটি ছোটো ল্যাবরেটারি বানিয়ে সেখানে গবেষণায় ব্যস্ত থাকতেন সব সময়। তিনিও বিয়ে-থা করেননি। তদন্তের সময় এও জানা গেল যে বৃন্দাবনবাবুর নিজের টাকাকড়ি যা ছিলো সবই নিজের গবেষণার কাজে নিঃশেষ হয়ে গেছে এবং তাঁর আরো টাকার প্রয়োজন ছিলো। তিনি তাঁর দাদা কাশীবাবুর কাছে চেয়েওছিলেন কিন্তু তিনি একটি পয়সাও দিতে রাজী হননি। আরো জানা গেল যে কাশীবাবু সম্প্রতি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করবার আয়োজন করছিলেন। যাই হোক, বৃন্দাবনবাবুই কাশীবাবুর একমাত্র ওয়ারিশ।

আগের দিন রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়ার একটু পরে কাশীবাবু তাঁর নিজের বাগানে বেড়াচ্ছিলেন প্রত্যেকদিনকার মতো। সেখানেই তাঁকে শেষ দেখে সে বাড়ির একমাত্র চাকর বিহারী। বাড়িতে বৃন্দাবন, কাশী আর বিহারী ছাড়া আর কেউ থাকতো না। কাশীবাবুর জন্যে বাইরের দরজা খোলা রেখে বিহারী নিজের ঘরে চলে গেল। বৃন্দাবনবাবুও নিজের পড়াশুনো শেষ করে বাতি নিভিয়ে

শুয়ে পড়লেন। কিন্তু তার পরদিন সকালবেলা দেখা গেল যে সদর দরজা ঠিক তেমনিই খোলা পড়ে রয়েছে এবং কাশীবাবু ঘরে নেই। প্রথমটা সবাই ভাবলো হয়তো তিনি মর্নিং-ওয়াক করতে বেরিয়েছেন। কিন্তু চায়ের সময় যখন ফিরলেন না তখন বিহারী তাঁর ঘরে গিয়ে দেখলো যে তাঁর বিছানা আগের দিন সন্ধ্যেবেলার মতো তেমনি নতুন পাট-ভাঙা চাদরে পরিপাটি হয়ে পড়ে আছে। কেউ রাত্তিরে ঘুমোয়নি সেখানে। তখন বৃন্দাবনবাবু এবং বিহারী একটু চিন্তিত হোলো। তারপর খাওয়ার সময়ও যখন কাশীবাবুর দেখা নেই তখন দুজনে চারদিকে খোঁজাখুঁজি শুরু করলো। তাতেও যখন কোনো কিনারা হোলো না তখন বৃন্দাবনবাবু থানায় ডায়েরি করলেন।

তদন্ত করে এমন কিছু জানা গেল না যাতে কাশী দে'র নিখোঁজ হওয়ার কারণ অনুমান করা যায়। তার বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার কোনো কারণ ছিলো না। বাড়ি তাঁরই এবং বাড়িতে কোনো অশান্তি ছিলো না। তাঁর খুন হওয়ার সম্ভাবনাও আমি ভেবে দেখলাম, কিন্তু এই অনুমানের পক্ষেও কোনো যুক্তি বা প্রমাণ পেলাম না। কিন্তু এটা কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না যে একটি জলজ্যান্ত মানুষ রাতারাতি হাওয়ায় উবে গেছে। আমার কেমন একটা সন্দেহ হোলো যে কাশীর ভাই বৃন্দাবনের সঙ্গে এই রহস্যের কোনো একটা যোগাযোগ আছে। ওর মুখ কিরকম যেন ফ্যাকাশে। এবং সে নিজে যেন মনে মনে বড্ডো অস্থির। কিন্তু কোনো যুক্তি প্রমাণের অভাবে শুধু সন্দেহের উপর কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব হোলো না। কাশীবাবুর অবর্তমানে তাঁর সম্পত্তির ওয়ারিশ হবেন বলে যে বৃন্দাবনবাবুর মত একজন দায়িত্ববান ভদ্রলোক, নাম করা কেমিস্ট এবং রিটায়ার্ড গভর্নমেণ্ট অফিসার কোনো খুনখারাপি করবে, একথা বলা খুব সহজ নয়।

আমি যখন প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছি, তখন কোনো একটা সূত্রে হঠাৎ জানতে পারলাম যে বৃন্দাবন দে খবরের কাগজে একজন পার্সন্যাল সেক্রেটারির জন্যে বিজ্ঞাপন দিয়েছে। অবশ্য সেই বিজ্ঞাপনে তাঁর নাম দেওয়া ছিলো না, ছিলো শুধু একটি বক্স নম্বর। —তবে আমরা জানতে পারলাম। আমাদের একটু অদ্ভুত মনে হোলো। কারণ তাঁর মতো একজন গবেষক যে সেক্রেটারি চাইছেন তার জন্যে কোনো স্টেনোগ্রাফির যোগ্যতা বা সায়েন্সে জ্ঞান চাইছেন না, চাইছেন এমন কতকগুলো যোগ্যতা যাতে মনে হয় যেন সেক্রেটারিকে সেক্রেটারির কাজের চাইতে বডিগার্ডের কাজেই বেশী যোগ্য হতে হবে। কেন?—আমি বার বার ভাবলাম। তাঁর কি ভয় হচ্ছে যে কেউ এবার তাঁকেও গুম করবে? তাই যদি হয় তো তিনি পুলিসকে জানাচ্ছেন না কেন?

কলকাতার ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের সহায়তায় আমি সেই খবরের কাগজের সঙ্গে এমন ব্যবস্থা করলাম যেন বিজ্ঞাপনের উত্তরের চিঠি তাঁকে পাঠানো না হয়, পাঠানো হয় শুধু আমাদের বানানো উত্তর কয়েকটি, যার মধ্যে একটি থাকবে আমাদের একজন লোকের আবেদনপত্র। এই সহজ ব্যবস্থা সফল হোলো। এবং আমাদেরই একজন লোক বৃন্দাবন দে-র সেক্রেটারি সেজে তার বাড়িতে গিয়ে উঠলো। তাকে যোগাযোগ রাখতে বলা হোলো আমার সঙ্গেই।

দিন দুই পরে তার কাছ থেকে জানতে পারলাম যে আমরা ঠিকই সন্দেহ করেছিলাম বৃন্দাবনবাবুর সম্পর্কে। কোনো অজ্ঞাত ব্যক্তি সম্বন্ধে ওঁর খুব ভয় এবং এই নূতন সেক্রেটারিকে সব সময় নিজের সঙ্গে সঙ্গেই রাখছেন। তাকে এক মুহূর্তও কাছছাড়া হতে দিচ্ছেন না। সে লোক এর বেশী কিছু বলতে পারলো না—শুধু বৃন্দাবনবাবুর দৈনন্দিন কাজকর্মের ধরণ ধারণ সম্বন্ধে

সামান্য দু'চার কথা, যা আমি নিজেই জানতাম। রাত্তিরে বৃন্দাবনবাবু নিজের ঘর ভেতর থেকে বন্ধ করে দিতেন। এবং আমাদের এই লোকটিকেও তাঁর সঙ্গে একই ঘরে শুতে হোতো।

এই লোকটির নাম অর্ধেন্দু। সে একদিন আমায় একটা অদ্ভুত কথা বললো।

বললো, "আমি রাত্তিরে ঘুমুতে পারছিনা কিছুতেই। যতোবারই ঘুম পায় মনে হয় যেন কেউ আমায় বিছানা থেকে ঠেলে ফেলে দিতে চেষ্টা করছে। অথচ চোখ খুলে দেখি কিছুই নয়। প্রথম রাত্তিরে ভেবেছিলাম আমি নিশ্চযই ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে খারাপ স্বপ্ন দেখছি। কিন্তু পরদিন রাত্তিরেও যখন এই একই ব্যাপার, আমার একটু ভাবনা হোলো। একবার ভাবলাম, বৃন্দাবনবাবু নয় তো! আলো জ্বালিয়ে দেখলাম, না, ওঁর বিছানায় উনি অঘোরে ঘুমোচ্ছেন।"

"উনি জেগে যাননি?" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "ওঁব পক্ষে কি এত গাঢ় ঘুম সম্ভব? আমার তো মনে হয়েছে ইদানিং উনি খুব নার্ভাস হয়ে আছেন সব সময়।"

"হ্যাঁ, কিন্তু উনি ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমোতে যান।"

ঘুমের ওষুধ খেয়ে! আমি একটু আগ্রহান্বিত হলাম, কিন্তু কিছু বললাম না।

অর্ধেন্দু বলে গেল, "পরদিন রাত্তিরে আমি জেগেই রইলাম। এবার আর মনে হোলো না যে কেউ আমায় ঠেলছে, কিন্তু মনে হোলো কেউ যেন খুব জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে ঘরের ভিতর। আলো জ্বালিয়ে দেখলাম, বৃন্দাবনবাবু নয়। ওঁর নিশ্বাস পড়ছে খুব মৃদু মৃদু। তারপর অন্ধকারে একবার মনে হোলো যেন একটা ছায়া ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘরের ভিতর। তাড়াতাড়ি আবার আলো জ্বেলে দেখি কেউ কোথাও নেই। শুধু বৃন্দাবনবাবু তাঁর বিছানায় ঘুমোচ্ছেন।

"ভূত নাকি ?" আমি হেসে জিজ্ঞেস করলাম। "ওর দাদা কালী দে'র ভূত বোধ হয়।"

অর্ধেন্দুও দন্ত বিকশিত করলো। বললো, "যাই হোক, আমার ঘাড় তো মটকায় নি এখন পর্যন্ত। তবে বৃন্দাবনবাবুও কি এরকম কোনো একটা কিছু ভয়টয় পেয়েছেন নাকি ?"

আমি বললাম, "আমার তা মনে হয় না। উনিও কি বিছানায় কারো ঠ্যালা খেয়েছেন না কি ঘরের ভিতর কারো লম্বা নিশ্বাসের আওয়াজ শুনেছেন। কী সব আবোল-তাবোল কল্পনা করতে সুরু করেছো।"

আমার ঠাট্টা অর্ধেন্দুর ভালো লাগলো না। সে বুঝতে পারলো যে আমি তার কথা বিশ্বাস করিনি। সে বললো, "বেশ, এক রাত আপনিও এসে থেকে দেখুন না।"

"বৎস, তারপর বৃন্দাবনবাবু টের পেয়ে যান যে তুমি পুলিশের লোক। আর আমিও যদি ওঁর ঘরে রাত কাটাই উনি কি খুশি হবেন ?"

যাই হোক, আমি রাজী হলাম। বৃন্দাবনবাবু ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমোন। উনি শুয়ে পড়ার পর যদি যাই, উনি টের পাবেন না। বিহারীকে হাত করা গেল। সেও বলে দেবে না। উনি যখন ঘুমিয়ে পড়বেন তখন অর্ধেন্দু আমায় ভিতর থেকে দরজা খুলে দেবে।

সেদিন রাত্তিরে আমি যখন গিয়ে পৌঁছালাম তখন বারোটা প্রায় বাজে। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই সাত-পাঁচ ভেবে আমি পকেটে রিভলবার নিয়ে গিয়েছিলাম। বৃন্দাবন বাবুর ঘুম তখন ঘুমের ওষুধের কল্যাণে খুব গভীর। ঘরের অন্য কোণে অর্ধেন্দুর খাট। দরজা বন্ধ করে আমরা খাটের উপর গিয়ে বসলাম।

ঘরের ভিতর বেশ অন্ধকার। তবে খুব ঘুটঘুটে অন্ধকার নয়, কারণ আকাশের কোথাও ক্ষীণ একফালি চাঁদ বোধ হয় ছিলো। ভিতর থেকে দেখা যাচ্ছিলো না বটে, কিন্তু জানলা দিয়ে একটুখানি ফিকে আলো আসছিলো ঘরের ভিতর। তাতে কিন্তু ঘরের ভিতরের অন্ধকার আরো বেশী দুঃসহ, আরো বেশী ভয়াবহ হয়ে উঠেছিলো। আমি আমার টর্চের আলো ফেললাম এদিক ওদিক, বেশী আসবাবপত্তর ছিলোনা। কারো পক্ষে কোণে কানাচে কোথাও লুকিয়ে থাকা অসম্ভব। বাড়িটি পুরোনো, বাড়ির বাইরে ইঁটের পাঁজর দেখা যায় জায়গায় জায়গায়, কিন্তু ঘরের ভিতর বেশ ভালো করে পলেস্তারা করে ডিসটেম্পার করা। কাশীবাবু বৃন্দাবনবাবু বাড়িটির কিছু অদলবদল করার প্ল্যান করেছিলেন, বাইরে কিছুদিন ধরে কাজও চলছিলো। ঘরের মেঝে মার্বেল করা, তার উপর দামী গালিচা।

"দেখা যাক," আমি খুব আস্তে আস্তে বললাম, "আজ বাড়ির কেউ আমাদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায় কিনা।"

বিছানার উপর আমি আর অর্ধেন্দু পাশাপাশি শুয়ে পড়লাম। আমার ইচ্ছে ছিলো জেগে থাকবার কিন্তু আমার চোখের পাতা ভারী হয়ে এলো। ঘুম পেয়ে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানিনা, হঠাৎ চমকে জেগে উঠলাম।

"কেন, কি হয়েছে," আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"মানে? আমিও তো তাই জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম," বললো অর্ধেন্দু।

"আমায় তুমি ঠেলে জাগাওনি?"

"তাই বুঝি মনে হোলো আপনার? আমি কিন্তু ঠিক বলতে পারছি না।"

"জানে ? তুমি কি বলতে চাও তোমার সেই ভূত না কে আমায় ঠেলে জাগিয়েছে ?" আমার মনে হোলো আমার গলাটা যেন একটু কেঁপে গেল। তাতে আরো রাগ হোলো আমার।

"আমি শুধু এটুকু বলতে পারি," অর্ধেন্দু আস্তে আস্তে বললো, "একজন কেউ আমাকেও ঠেলে জাগিয়েছে। আমার আরো দু তিন রাত্তিরের অভিজ্ঞতা না থাকলে মনে করতাম সে আপনি। আপনি যখন ন'ন, তখন নিশ্চয়ই অন্য কেউ। তাকে ভূত বলুন বা যা খুশি বলুন।"

আমি টর্চের আলো ফেললাম বৃন্দাবনবাবুর বিছানার উপর। দেখলাম, উনি গভীর ঘুমে অচেতন। নাক ডাকছে। গোঙাচ্ছেন অল্প অল্প।

"ভদ্রলোক তো বেশ আরামে ঘুমোচ্ছেন," আমি বললাম, "আমাদের ভূত বাবাজী এসব রসিকতা বৃন্দাবনবাবুর সঙ্গে করলেই তো পারে।"

"ভদ্রলোকের ঘুম এত গভীর," অর্ধেন্দু বললো, "যে ওঁকে জাগানো কোনো ভূতের কর্ম নয়।"

আমি একটু ভাবলাম। এসব বৃন্দাবনবাবুর কোনো কারসাজি নয় তো ? অর্ধেন্দুকে বললাম, "তুমি ঘুমিয়ে পড়ো। আমি জেগে আছি। যদি কেউ তোমাকে ঠেলে জাগাবার চেষ্টা করে তো আমি আছি।"

অর্ধেন্দু চোখ বুঁজলো।

কেটে গেল আরো এক ঘণ্টা। হঠাৎ অর্ধেন্দু উঠে বসলো।

"আবার!" সে ফিসফিস করে বললো, "আপনি দেখতে পেলেন ?"

আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলাম। আমি কিছুই দেখতে পাইনি। হয় অর্ধেন্দু কোনো মানসিক বিকারে ভুগছে, তা নইলে—

তা নইলে এখানে সস্তা ডিটেকটিভ উপন্যাসের মতো রহস্য বলুন রোমাঞ্চ বলুন যা হোক একটা কিছু ঘটছে।

এবার তাকে বসিয়ে রেখে আমি শুয়ে পড়লাম। আমি ঘুমোইনি, শুধু চোখ একটুখানি আধবোঁজা করে রাখলাম, যাতে যে ঠেলবে সে অর্ধেন্দু না অন্য কেউ, সেটা ধরতে পারি।

দেখলাম, অন্ধকারে অর্ধেন্দুর কালো দেহরেখা বিছানার উপর চুপ-চাপ, নিশ্চল, পাহারারত।

হঠাৎ আমি লাফিয়ে উঠে টর্চ জ্বাললাম। কে যেন খুব জোরে ধাক্কা দিয়েছে আমায়। অর্ধেন্দু নয়—কারণ আমার নজর ছিলো তার উপর। পেছন দিক থেকে অন্য কেউ। এত ঠাণ্ডা সেই স্পর্শ যে, হঠাৎ আমার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিলো। আমার কিরকম যেন আবছা মনে হোলো যে একটি ছায়া সরে গেল একদিকে।

আলো জ্বালিয়ে সারা ঘর খুঁজে দেখলাম। কেউ কোথাও নেই। শুধু বৃন্দাবনবাবু ঘুমোচ্ছেন নিজের বিছানায়। অর্ধেন্দু কোনো কথা বললো না, শুধু তার চোখদুটো যেন বললো—এবার বিশ্বাস হোলো তো?

"নিশ্চয়ই বৃন্দাবনবাবু," আমি বললাম।

"না," অর্ধেন্দু উত্তর দিলো, "আমি তো জেগে আছি। আর আমাদের ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে, আমরা উঠে পড়বার আগেই আমাদের অজান্তে এদিক থেকে ওদিকে হেঁটে গিয়ে কোনো আওয়াজ না করে খাটে শুয়ে পড়ে, গায়ের উপর চাদর টেনে ঘুমের ভান করে নাক ডাকানো অসম্ভব ব্যাপার।"

আমিও মেনে নিলাম ওর কথা। টর্চ নিবিয়ে খাটের উপর বসে পড়ে বললাম, "যা দেখছি, আজ রাত্তিরে আর ঘুমানো যাবে না।"

সেই নিঝুম অন্ধকারে আমরা চোখ মেলে বসেই রইলাম। মাথায় একটার পর একটা আবোল তাবোল ভাবনা এলো যা দিনের আলোয় হয়তো হেসেই উড়িয়ে দিতাম।

আরো একটি ঘণ্টা কেটে গেল। হঠাৎ একটা মৃদু গুঁতো অনুভব করলাম একপাশে। এবার এটা অর্ধেন্দুর কাছে থেকেই। আমি মুখ তুলে দেখি—

দেখি—এ কি!—দেখি একটি আবছা ছায়া ওপাশের দেওয়ালের গায়ে ঠিক মাঝখানে হাত পা গুটিয়ে গুঁড়ি মেরে বসে আছে।

টর্চ জ্বাললাম তাড়াতাড়ি। নাঃ, কোথাও কিছু নেই।

"এসব কি রসিকতা, কিছুই বুঝতে পারছি না," আমি বললাম।

"দেখা যাক কী ব্যাপার," বললো অর্ধেন্দু।

আমার আর উঠে খোঁজাখুঁজি করবার ইচ্ছে হোলো না। টর্চ নিবিয়ে আবার চুপচাপ বসে রইলাম। কিন্তু এবার আস্তে আস্তে পকেট থেকে রিভলবারটা বার করলাম। রহস্য যাই হোক না কেন—আমি ভাবলাম—ছায়া থাকলে কাছাকাছি কোথাও একটা কিছু থাকবে, এবং ভালো শট্ হিসেবে আমার নাম আছে।

আবার দেখতে পেলাম। এবার পরিষ্কাব, নিখুঁত প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি রেখা। একটি মানুষের দেহ, কি রকম একটা অদ্ভুত ভঙ্গিতে ওপাশের দেওযালেব গায়ে হাত পা গুটিয়ে লেপটে বসে আছে।

আমি তিনটে গুলি করলাম পর পর। ছায়াটা যেন মেঝের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো।

পরমুহূর্তেই ঘরের আলো জ্বলে উঠলো। সুইচের কাছে অর্ধেন্দু দাঁড়িয়ে।

কিন্তু ঘরের মেঝেতে কোথাও কিছু নেই। দেওয়ালের গায়ে তিনটে গর্ত, একটা বেশ বড়ো। সামনের মেঝেতে দেওয়াল

থেকে খসে পড়া পলেস্তারার টুকরো। আমি অবাক হয়ে দেখলাম। আর কিছু নেই মেঝেতে। কিন্তু আমি পরিষ্কার দেখছিলাম গুলির আঘাতে একজন মেঝের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। এ কি পাঁচকড়ি দে-র ডিটেকটিভ উপন্যাস, যে একটা জলজ্যান্ত দেহ মেঝের কোনো চোরাদরজা দিয়ে নিচে গলে পড়বে ?

"কি ব্যাপার ? কি হয়েছে ?"—ফিরে তাকিয়ে দেখি ঘুম ভেঙে বৃন্দাবনবাবু খাট থেকে উঠেছে।—"আপনি ? আপনি এখানে ?"—অবাক হয়ে ঘুম জড়ানো চোখে আমার দিকে তাকালো।—"কে আপনাকে এখানে আনলো ? কি হয়েছে ? গুলি করলো কে ?" হেঁটে এগিয়ে এলো আমাদের দিকে।

আমি বললাম, "আমার মনে হোলো কাকে যেন দেখলাম। গুলি করতে সে পড়ে গেল। কিন্তু আলো জ্বালিয়ে দেখি কেউ নেই। শুধু দেওয়ালের গায়ে গুলির গর্ত।"

আমরা দেওয়ালের দিকে পিছন ফিরে ছিলাম। বৃন্দাবনবাবু দেওয়ালের দিকে তাকালো।

আর বিরাট চিৎকার করে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে।

আমরাও ফিরে দাঁড়ালাম সঙ্গে সঙ্গে। আমরাও দেখতে পেলাম, যা এতক্ষণ চোখে পড়েনি। যদি মেঝেতে কারো রহস্যজনক দেহ খোঁজবার চেষ্টা না করতাম এতক্ষণ, চোখে পড়তো আমাদেরও।

বিস্ময়ে আমাদের প্রায় দম বন্ধ হয়ে এলো।

বিরাট চিৎকার করে—পাগলা গারদের মতো বিকট চিৎকার করে বৃন্দাবনবাবু মাটিতে ঢলে পড়লো। শিউরে কেঁপে উঠলো নিস্তব্ধ অন্ধকার কালো ঘুটঘুটে রাত।

দেওয়ালের গায়ে, যেখানে গুলি লেগে পলেস্তারার চাঁই খসে পড়েছে, সেখানে ইটের ফাঁক থেকে বেরিয়ে আছে একটি আঙুল,

একটি শুকনো কোঁকড়ানো, ছাতা ধরে যাওয়া আঙুল, মৃতদেহের ঠাণ্ডা, নিশ্চল, নিঃসাড় আঙুল।

* * * *

জ্ঞান ফিরে আসতে বৃন্দাবনবাবু সব স্বীকার করলো। বাগান থেকে ঘরে ঢুকতেই বুকের পাঁজরে খুব জোরে একটি লোহার রড দিয়ে মেরে কাশীবাবুকে অজ্ঞান করে ফেলেছিলো তার ভাই বৃন্দাবন। তারপর তাকে বয়ে নিয়ে গিয়েছিলো নিজের শোবার ঘরে। তারপর শ্বাস রোধ করে প্রাণবায়ু বহির্গত করানো ছুমিনিটের কাজ। মতলব করা ছিলো অনেক দিন থেকেই। শোয়ার ঘরে মেরামত ইত্যাদি করা হচ্ছিলো কিছুদিন থেকে। দেওয়ালের গায়ে কিছু ইট আলগা করে রাখা ছিলো। বড়ো গর্ত করে রাখা ছিলো আগে থেকেই। লাশটি সেই গর্তে পুরে, ইট বসিয়ে বৃন্দাবনবাবু নিজের হাতেই পলেস্তারা করে দিয়েছিলো। তার পরদিন সকালে রংমিস্ত্রী আর মজুরেরা কাজ করতে এলো প্রতিদিনকার মতো, কেউ কিছু জানলো না, চুনকাম করে, ডিসটেম্পার করে ছু-দিনে কাজ টাজ শেষ করে চলে গেল। ইতিমধ্যে কাশীবাবুর জন্যে খোঁজাখুঁজি শেষ হয়ে গেছে কিন্তু এদিকে কেউ কোন সন্দেহ করেনি।

কিন্তু পলেস্তারার কাজটি বৃন্দাবনকে একা করতে হয়েছিলো। উত্তেজনার মাথায় সে খেয়াল করেনি যে ছুটো ইটের মাঝখানে একটি আঙুল বেরিয়ে আছে, আনমনে তাড়াতাড়ি তার উপর পলেস্তারা করে গেছে।

সে যে এই ভুল করেছে—পূর্ণাংশু গুহ বলে গেল—সেটা এমন কিছু আশ্চর্য ব্যাপার নয়। অপরাধীরা সব কিছু ঠিক মতো করেও প্রায় শেষ দিকে কোনো না কোনো একটা সাংঘাতিক ভুল করে বসে। তবে যা আমি সব সময়েই ভাবতাম আর কোনোদিনই এর কোন সমাধান করতে পারতাম না, সেটা হলো কি করে আমাদের এই মনের ভুল হলো

যে কেউ আমাদের ঠেলে জাগিয়ে দিচ্ছে, কি করে চোখের ভুল হলো যে কেউ দেওয়ালের গায়ে গুঁড়ি মেরে বসে আছে—এবং এই মনের ভুল আর চোখের ভুল থেকে একটি গুম করে ফেলা লাশ উদ্ধার করা সম্ভব হোলো। একে ভৌতিক ব্যাপার বলতে পারেন, অনৈসর্গিক ব্যাপার বলতে পারেন, হয়তো বলতে পারেন যে, অবচেতন মনের উপর পরিপার্শ্বিক সন্দেহজনক পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়া,যা এত সূক্ষ্ম যে, চেতন মন সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেছে—যা খুশী বলতে পারেন। শুধু এ কথা বলবেন না যে পুলিসের লোকেরা এত বেশি যুক্তিবাদী ও বস্তুতান্ত্রিক যে, যা কিছু নিজের প্রত্যক্ষ যুক্তি ও বুদ্ধির বাইরে, তাতে বিশ্বাস করে না।

আরেকদিন রোববার সন্ধ্যে।—যতো কাজই থাক, অসিত চ্যাটার্জী বনানী মৈত্রের বাড়িতে রোববারের আসর কিছুতেই কামাই করতো না। সেদিন কি একটা কাজে আটকে পড়েছিলো কোথাও, আসতে দেরি হয়ে গেল। ততক্ষণে অন্ধকার হয়ে এসেছে। আকাশে নতুন আষাঢ়ের মেঘ জড়ো হচ্ছে একটু একটু করে। অসিত ছুটতে ছুটতে গেট ঠেলে ভেতরে ঢুকলো। দেখতে পেল বসবার ঘরে আলো জ্বলছে, স্ত্রী-পুরুষের মিলিত কণ্ঠের গল্প গুঞ্জবের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে ঘরের ভিতর থেকে। কিন্তু বাইরের বারান্দা অন্ধকার, সেখানে কোনো আলো জ্বলছে না।

তিন-চার ধাপ সিঁড়ি পেরিয়ে বারান্দায় উঠে ডাইনে ঘুরতেই অসিত হঠাৎ চমকে উঠলো। কোথাও কেউ ছিলো না, হঠাৎ একটা চাপা পদধ্বনি শুনতে পেয়ে অসিত চট করে দাঁড়িয়ে পড়লো। হঠাৎ যেন একটি ছায়া দেখা গেল এক কোণে।

কে ওখানে ?—জিজ্ঞেস করলো অসিত। নিজের গলা শুনে নিজেরই হাসি পেলো। প্রত্যেক রোববার অবাস্তব অদ্ভুত গল্প শুনে কি নিজেও এসব বিশ্বাস করতে শুরু করলো নাকি মনস্তত্ত্ববিদ অসিত চ্যাটার্জী ? এবার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলো সহজ ভাবেই—কে ওখানে ?

একটা হাসি শুনতে পেল সে। আর শিরদাঁড়া বেয়ে বরফের স্রোত নেমে গেল।

"তোমার আজ দেরি হোলো কেন ?"—সেই ছায়া নরম গলায় তাকে জিজ্ঞেস করলো।

তোমার। অসিত স্তম্ভিত হোলো। এখানে তাকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করছে কে ?

সে অসিতের সামনে এসে দাঁড়ালো। পথের আলো এসে পড়লো তার মুখের উপর।

"ও, তুমি।" অসিত হেসে ফেললো। তারপর অবাক হয়ে অবহিত হোলো যে, বনানীকে সেও 'তুমি' বলে সম্বোধন করে ফেলেছে।

"আমি কতক্ষণ ধরে তোমার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি," বনানী আস্তে আস্তে বললো।

ভেতরে সবাই লক্ষ্য করলো যে অসিত চ্যাটার্জী আর বনানী খুব হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকেছে।

কান্তি রায়চৌধুরী তখন সবে একটি গল্প বলতে শুরু করেছে। ঘরের সব আলোগুলো নেবানো, শুধু এককোণে একটি টেবিল ল্যাম্পের আলো জ্বলছে। বাইরের পথ অন্ধকার, নির্জন, নিস্তব্ধ। প্রত্যেকের হাতেই একটি করে চায়ের কাপ। মেয়েদের চোখে একটুখানি মনগড়া শঙ্কার আমেজ। পুরুষদের চোখ ফ্যাকাশে

আকাশের মেঘ আরো ঘন হয়ে এসেছে। মাঝে মাঝে ম্লান বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে সামনের বাড়িগুলোর ছাতের ওপরে খোলামেলা আকাশে। ঘরের ভেতরে আর বাইরে তৈরী হয়েছে রোববারের আষাঢ়ে গল্পের নিখুঁত পরিবেশ।

অসিত আর বনানীকে হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকতে দেখে অপূর্ব লাহিড়ী জিজ্ঞেস করলো, "ব্যাপার কি?"

"অসিতবাবু অন্ধকারে আমায় অন্য কিছু ভেবে আচমকা ভয় পেয়েছিলেন," উত্তর দিলো বনানী।

"অন্য কিছু ভেবেছিলাম ঠিকই," অসিত প্রতিবাদ করে বললো, "কিন্তু ভয় পাইনি।"

"বনানীর মতো চেহারা যদি মানুষের না হয়ে অন্যকিছুর হয়, তাহলে মনে আর যাই হোক ভয় হবে না কোনদিন," বলে উঠলো বিভূতি দত্ত।

"ওরে বাবা", বলে উঠলো মীনা সেন, "বনানী কেন, নূরজাহানের মতো চেহারা হলেও আমি ভয় পাবো।"

"সে যদি আপনার বন্ধু হয়, সে যদি আপনার উপকার করে, তাহলে মিছেমিছি ভয় পাবেন কেন?" জিজ্ঞেস করলো অমরেশ গুপ্ত।

"ভয় পাওয়ার বা না পাওয়ার কোনো কারণ নেই," বলে উঠলো পরিমল সেনগুপ্ত। "আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানি, একবার একটা অদ্ভুত ঘটনায় আমরা ভয় পাইনি, সেই ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আমার এক বন্ধু রীতিমত মজা পেয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু আমাদের পরিচিতা এক মহিলা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন।"

সবাই পরিমল সেনগুপ্তকে ঘিরে বসলো।

বছর দু-তিন আগেকার কথা,—শুরু করলো পরিমল সেনগুপ্ত।—আমার এক বন্ধুর বাড়িতে বসে আমরা কয়েকজন স্পিরিচুয়্যালিজ্‌ম নিয়ে আলোচনা ও তর্ক করছিলাম। আমি তো ওসব একেবারেই মানিনা। আমার বন্ধু খুব মানে, বিশ্বাস করে, প্ল্যাঞ্চেটে এর ওর তার প্রেতাত্মাকে ডাকে। আমরা খুব তর্ক করছিলাম টেবিল আর চেয়ারে হাত চাপড়ে। সেখানে আরো দু-চারজন ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের কেউ আমার পক্ষ, কেউ বা আমার বন্ধুর পক্ষ নিয়ে কথা বলছিলো। এমন সময় সেখানে আরেকজন ভদ্রলোক এসে উপস্থিত হোলেন। বছর ছত্রিশ, সাঁইত্রিশ তার বয়েস, বেশ সুন্দর স্বাস্থ্যবান চেহারা। আমার বন্ধু আলাপ করিয়ে দিলো। সে হোলো কোনো এক বিলিতী কোম্পানীর চীফ অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট, নাম রমেন হালদার। আমার বন্ধুর সঙ্গে বিলেতে একসঙ্গে ছিলো, মাঝখানে অনেকদিন দেখা হয়নি। সম্প্রতি কলকাতায় বদলি হয়ে এসে দেখা করতে এসেছে।

সে আমাদের আলোচনা খানিকক্ষণ চুপচাপ শুনলো। তারপর আস্তে আস্তে বললো, "আপনারা যদি সত্যি সত্যি একটি ভূত দেখতে চান, আমি এক্ষুণি আপনাদের সঙ্গে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে আনতে পারি।"

আমরা সবাই একটু অবাক হয়ে তার দিকে তাকালাম। তারপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কোথায়? চিড়িয়াখানায়?"

আমার রসিকতায় আমার সমর্থক দু-একজন হাসলো, কিন্তু রমেন হালদার গায়ে না মেখে সহজভাবে বললো, "আমার বাড়িতে।"

"সত্যি সত্যি ভূত? তোমার বাড়িতে?" শুকনো গলায় বললো আমার বন্ধুর-স্ত্রী। মেয়েদের চোখে একটু ভয়-ভয় চঞ্চলতা, পুরুষদের ঠোঁটের কোণে একটু অবিশ্বাসের বাঁকা হাসি। তবু সবাই আগ্রহান্বিত হোলো।

সুতরাং সবাই মিলে—স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়ে আমরা সাত-আট জন হবো—ভূত-দর্শন যাত্রায় বেরোলাম।

রমেন হালদার তার গাড়িতে চাপিয়ে আমাদের যেখানে নিয়ে গেল সে জায়গাটা বেহালার একটু বাইরে। একটি মস্তো বড়ো কম্পাউণ্ড-ঘেরা ছোট্টো বাংলো-বাড়ি.—সেখানেই সে থাকতো।

সে ঘড়ি দেখে বললো, "এখনো সময় হয়নি। সুতরাং চা খাওয়া যাক। যদি বলেন তো শরবতেরও ব্যবস্থা করতে পারি।"

সেখানকার নিথর নিঝুম থমথমে পরিবেশে সবারই যেন একটুখানি শীত-শীত করছিলো। সুতরাং শরবতে কেউ রাজী হলাম না, সবার জন্যে চা এলো।

আমি চারদিক একটু ঘুরে ফিরে দেখলাম। বাইরে অন্ধকার, চারদিকে বেশ একটা পাড়াগাঁর মতো স্নিগ্ধ, শান্ত পরিবেশ। ঝোপে-ঝাড়ে অসংখ্য ঝিঁঝিপোকার ডাক। রমেন হালদার বিয়ে-থা করেনি। শুধু একটি চাকর নিয়ে এই বাংলোতে থাকে, ঘরদোর বেশ পরিষ্কার, ঝকঝকে, বসবার ঘর শোয়ার ঘর ভালো ভালো আসবাব-পত্তরে খুব পরিপাটি করে সাজানো। এত সুন্দর, পরিষ্কার, পরিপাটি যে মনেই হয়না এ-বাড়িতে বাস করে একজন অবিবাহিত পুরুষ।

চারদিকে যখন বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে, রমেন হালদারের চাকরকে দেখে মনে হোলো যেন আস্তে আস্তে ভয়ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। আমাদের চা শেষ হওয়ার পর সে খাওয়ার টেবিলে রমেনের ভাত-তরকারি ঢাকা দিয়ে চলে গেল। আর হ্যারিকেন লণ্ঠনের আলো দুলতে দুলতে বাগান পেরিয়ে ফটকের বাইরে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর রমেন বললো. "আমি আপনাদের যা দেখাবো সেটা দেখানোর আগে এটা জানতে চাই যে আপনারা এসব অবাস্তব কিছু বিশ্বাস করেন না, অথবা এতে ভয় পান না। তা নইলে আজকের অভিজ্ঞতা আপনাদের পক্ষে খুব প্রীতিকর নাও হতে পারে।"

"ওরে বাবা, ও কথা বলবেন না", বলে উঠলো অলকা বোস নামে এক মহিলা। "আমি বিশ্বাস করি এবং এখন থেকেই ভয় পাচ্ছি একটু একটু।"

অলকা বোসের সহচর ছিলো আমাদের একজন বন্ধু, অমিত সান্যাল। সে তাকে আশ্বাস দিয়ে বললে, "কোনো ভয় নেই, আমি থাকতে কেউ তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।" বাজারে গুজব—অনতিকালের মধ্যে অলকা বোসের সঙ্গে অমিত সান্যালের বিয়ে হবে এবং ওদের দেখেও তাই মনে হোতো। এখনও দেখলাম অমিতের কথায় অলকা আশ্বস্ত হোলো।

আমার বন্ধু সুরজিত ভট্টাচার্যের স্ত্রী অরুন্ধতী একটা বেড়াল কোলে তুলে নিয়ে আদর করছিলো। সাদা আর কালোতে মেশানো তার লোম, কিছুক্ষণ থেকে আমাদের পায়ের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করে এর ওর তার পায়ে মাথা ঘষছিলো। গলায় তার একটি গোলাপী সিল্কের রিবন বাঁধা। অরুন্ধতীর খুব বেড়ালের শখ। সে চুমকুরি দিয়ে ডাকতেই বেড়ালটি লাফিয়ে উঠে এলো অরুন্ধতীর কোলে। সে তাকে আদর করতে করতে রমেনকে জিজ্ঞেস করলো, "তুমি আবার বেড়াল পুষতে শুরু করছো কবে থেকে?"

রমেন একটু হেসে উত্তর দিলো, "আমি এ বাড়িতে আসবার দিন দুয়েকের মধ্যেই এ-ও এসে উপস্থিত হোলো। প্রত্যেকদিন আমার খাওয়ার সময় আমার দুধ মাছের ভাগ পেতে পেতে ও আমার খুব বন্ধু হয়ে উঠেছে। আমার উপকারও করেছে খুব। অনেক ইঁদুর ছিলো এ বাড়িতে। সবগুলোকে তাড়িয়েচে। আজকাল ইঁদুর একটিও দেখতে পাওয়া যায় না। এমন ইঁদুরের যম যে কলকাতার শহরে বেড়াল বলে বিশ্বাসই হয় না।"

"এই বেড়ালটা আমায় দিয়ে দাও, আমি নিয়ে যাই", বললো অরুন্ধতী।

অরুন্ধতীর মার্জার-প্রীতি তার স্বামী সুরজিত একটুও সহ্য করতে পারতো না, সুতরাং এ আলোচনা তার একঘেয়ে লাগছিলো, সে একটু অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলো, "কই হে রমেন, তুমি কি যেন দেখাবে বলছিলে ?"

"হ্যাঁ, এবার সময় হয়ে এসেছে", বললো রমেন। তার কণ্ঠস্বর আস্তে আস্তে গম্ভীর হয়ে এলো। "এই বাড়িতে আমি ছাড়া আরো একজন থাকেন, তাঁকে দেখা যায় না, কিন্তু তাঁর চলে ফিরে বেড়ানো শোনা যায়।"

এটুকু বলে সে চুপ করে রইলো অনেকক্ষণ। আমরাও কেউ কোনো কথা বললাম না। চারদিক নিথর নিস্তব্ধ। ঝিঁঝিপোকা-গুলোও স্তব্ধ হয়ে গেছে।

হঠাৎ ঢং ঢং করে ঘড়িতে আটটা বাজতে শুরু করলো। একটা দমকা হাওয়া বাইরের গাছগুলোর শাখাপ্রশাখা নাড়া দিয়ে চলে গেল।

"এবার আসবার সময় হয়েছে," আস্তে আস্তে বললো রমেন হালদার।

আমাদের কারো মুখে কোনো কথা নেই। এই স্তব্ধতা আমার একটু নাটকীয় মনে হোলো। তবু রমেনের কথার ধরনে সেই কয়েক মুহূর্তের জন্যে যেন পরিবেশটা মনে মনে স্বীকার করে নিলাম।

"ওই তার পায়ের সাড়া শোনা যাচ্ছে," আরো আস্তে আস্তে রমেন হালদার বললো।

আর সঙ্গে সঙ্গে আমরা পরিষ্কার শুনতে পেলাম। সেই স্তব্ধতার মধ্যে বেশ পরিষ্কার শুনতে পেলাম, বাগানের মাঝখানের কাঁকরের পথ বেয়ে একজোড়া স্লিপার পায়ে কে যেন হেঁটে আসছে। আমি বসেছিলাম জানলার কাছেই। মুখ ফিরিয়ে কাউকে দেখতে পেলাম না বাগানের মধ্যে।

সেই চরণধ্বনি বাগান থেকে বাড়িতে উঠে এলো কয়েক ধাপ সিঁড়ি পেরিয়ে। স্থিরভাবে হল্ অতিক্রম করে বাড়ির অন্তপ্রান্তে মিলিয়ে গেল।

সুরজিত ভটচায তাড়াতাড়ি দরজার বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো। সে দেখতে পেলো না। একটা গভীর বিস্ময় ভেসে উঠলো তার মুখের উপর।

"এর মানে?" সে জিজ্ঞেস করলো। ঘরে হাল্কা আলোয় ফ্যাকাশে দেখালো তার মুখ।

আমি হেসে জিজ্ঞেস করলাম, "রমেনবাবু সত্যি সত্যি আমাদের ভূত বিশ্বাস করাতে চান নাকি?"

রমেন হাসতে হাসতে উত্তর দিলো, "নিজের কানে তো শুনলেন। আমার কথা বিশ্বাস না হয়তো গিয়ে তদারক করে দেখুন।"

কি বলবো ভেবে পেলাম না। আমি কিছুই দেখতে পাইনি, কিন্তু স্লিপারের আওয়াজ তো শুনতে পেয়েছি।

"আপনারা শুনতে পেয়েছেন তাহলে," রমেন হালদার বললো। আবার গম্ভীর শোনালো তার গলা। "আর, আমি নিশ্চিন্ত হলাম। আমার সন্দেহ ছিলো আমি হয়তো কোনো মানসিক ব্যাধিতে ভুগছি। স্লিপারের শব্দ যে সত্যিসত্যি শোনা যায়, সেটা আমার কল্পনা নয়—সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্যই আমি আপনাদের সবাইকে এখানে নিয়ে এসেছি।"

সে আমাদের সমস্ত ঘটনাটা খুলে বললো।

এই অশরীরী চরণধ্বনি সে শুনতে পাচ্ছে, সে যে-দিন এবাড়িতে ঢুকেছে সেদিন থেকেই। প্রত্যেকদিন সন্ধ্যেবেলা স্লিপারের শব্দ বাগানের পথ পেরিয়ে সিড়ির ধাপ বেয়ে ঘরে উঠে আসে, হল্‌ঘর অতিক্রম করে বাড়ির পেছনদিকে মিলিয়ে যায়। তারপর হঠাৎ

শোনা যায় বাথরুমে ফোয়ারা থেকে জল পড়ছে। কেউ যেন প্রাণভরে স্নান করছে সেখানে।

ইতিমধ্যে রমেন চুপচাপ নিজের আহার-পর্ব সেরে নেয়। বাথরুমেও জলপড়া বন্ধ হয়। কারো যেন স্নান শেষ হয়েছে। বাথরুমের দরজা খুলে সে বেরিয়ে আসে। আবার সশব্দে দরজা বন্ধ করে দেয়। স্লিপারের শব্দ স্নানের ঘর থেকে এগিয়ে যায় শোয়ারঘরের দিকে। খাওয়া শেষ করে রমেন উঠে পড়ে। বাথরুমে গিয়ে দেখে বাথরুম ভেজা। বাথরুম ভরে সাবানের ভুরভুরে মিষ্টি গন্ধ। রমেন হাতমুখ ধুয়ে দাঁত মেজে শোয়ার ঘরে ফিরে আসে। এসে দেখে কেউ যেন ঘরটা গুছিয়ে দিয়েছে এই মাত্র। বিছানাটা ঝেড়ে পুঁছে দিয়ে চাদরটা ভালো করে পেতে দিয়েছে, অফিস থেকে ফিরে এসে বিছানার উপর ফেলে রাখা কোর্ট প্যাণ্ট টাই হ্যাঙারে টাঙিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছে আনলায়।

এতে রমেন বিস্মিত হলেও আপত্তি করে নি, কারণ যে হেতু ঘরের মধ্যে কাউকে দেখতে পায় না এবং কেউ তাকে কোনো-রকম ভাবে বিরক্ত করে না, সেও আপত্তি করার কোনো কারণ পায় না। রমেন চুপচাপ আলো নিভিয়ে বিছানায় গড়িয়ে পড়ে। আর সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করে আরো একজন যেন বিছানায় ঠিক তার পাশে এসে বসেছে। একটা মিষ্টি দেহ সৌরভ তার নাকে ভেসে আসে। রমেন হাত বাড়িয়ে দেখতে যায়, কিছুই পায় না। কেউ থাকলে তো পাবে! রমেন চোখ বোঁজে। একটু পরেই মুখের উপর অনুভব করে উষ্ণ নিশ্বাস। কারো নরম মুখ যেন তার মুখের ওপর আস্তে আস্তে নেমে আসছে। সে তাড়াতাড়ি চোখ খোলে। কাউকে দেখতে পায়না। সে তখন আবার চোখ বুঁজে আবার ঘুমিয়ে পড়ার চেষ্টা করে। তখন মনে হয় কেউ যেন তার ঠিক পাশেই শুয়ে পড়েছে। নাকের কাছেই মিষ্টি ক্রীমের গন্ধ, যা মুখে

মেখে শয্যা গ্রহণ করে অসংখ্য সংসারের বধূরা। আহা, কী রোমান্টিক —রমেন ভাবে। যদি সত্যি সত্যিই এরকম একজন কেউ হোতো! ভাবতে ভাবতে চোখ দুটো আবেশে আর ঘুমে বুজে আসে।

আচমকা একজন কেউ যেন তাকে চেপে ধরে নিবিড় নিষ্ঠুর, বরফ কঠিন বাহুবন্ধনে। ঠাণ্ডা, বড়ো ঠাণ্ডা সেই বাহুবন্ধন, ঠিক ফ্রিজিডেয়ার থেকে বার করে আনা আইসক্রীমের মতো। একটা চাপা ভয়ার্ত আর্তনাদ করে রমেন তাড়াতাড়ি উঠে বসে, আলো জ্বালে বেড স্যুইচ টিপে,—কই, না তো, ঘরের মধ্যে কোথাও কেউ নেই।

এমনি করে দিনের পর দিন, প্রত্যেকদিন রাত্রিবেলা সেই অজানিতার তিমির-অভিসার।

প্রথমটা রমেন হালদার ভেবেছিলো এ হয়তো তার সুদীর্ঘ অবিবাহিত জীবনের স্নায়বিক অবসাদ, যার দরুণ সে এই নিঃসঙ্গ বাড়ির অন্ধকারে এরকম সব কল্পনা করে। সুতরাং সে তার রাত্রের অভিজ্ঞতার অনুভূতি নিয়ে দিনের বেলা আর মাথা ঘামাতো না। কিন্তু যখন একদিন দেখল তার চাকরও স্লিপারের শব্দ শুনে ভয় পেয়েছে এবং সন্ধ্যার পর বাড়িতে থাকতে চাইছে না তখন রমেন একটু শঙ্কিত হলো। দুজন লোকের পক্ষেই একি রকম ভ্রান্তি হওয়া সম্ভব নয়।

সে একহপ্তা ধরে এ রহস্যের সমাধান করবার চেষ্টা করলো। স্নানের ঘরের ফোয়ারা থেকে জলে পড়ার শব্দ শুনলেই সে তাড়াতাড়ি সেখানে ঢুকে পড়তো ওখানে কে আছে দেখবার জন্যে। (প্রথমবার ঢুকতে সত্যিসত্যিই কুণ্ঠিতবোধ করছিলাম—রমেন বলছিলো—যদি সত্যি সত্যি দেখা যায় এই রহস্যময়ীকে।) কিন্তু স্নানের ঘরে দেখতে পেতো আলো জ্বালানো, বাথটাব জলে প্রায় ভরে এসেছে, আর চারিদিকে দামী সাবানের ভুরভুরে মিষ্টি গন্ধ। কিন্তু—কোন লোকজন নেই সেখানে। শোয়ার ঘরে যখন আলো জ্বলে উঠতো

রমেন ছুটে যেতো ঘরের ভিতর। সেখানেও দেখতে পেতো না কাউকে। কিন্তু তার ধুতি শার্ট পাট করে আলনায় তুলে রাখতে যাবে কে? কয়েকদিন তার ধারণা হোলো হয়তো কোন প্রতিবেশী দুষ্টু মেয়ে এসব ছেলেমানুষি করছে তার সঙ্গে। দিন দুই তাকে ধরবার জন্যে সে লুকিয়েও রইলো। কিন্তু কাউকে পেলো না। তারপর সে সন্ধ্যার পর দরজা জানালা বন্ধ করে রাখবার চেষ্টা করলো। কিন্তু তা সত্বেও দিনের পর দিন সেই চরণধ্বনি, স্নানের ঘরের ফোয়ারার জলের শব্দ, শোয়ার ঘরে জামাকাপড় পাট করে তুলে রেখে বিছানাটি ঝেড়ে পুঁছে ফিটফাট করে রাখা।

এসবে রমেন বিচলিত হওয়ার কিছু পায় না। যার পায়ের শব্দ ঘরের ভিতর যেখানে ঘুরে বেড়াবে বেড়াক—তাকে বিরক্ত না করলেই হলো। স্নানের ঘরে যে জল ছেড়ে দিয়ে স্নান করবে করুক, কিছু আসে যায় না। একজনের প্রয়োজনের অনেক বেশী জল সেখানে আছে। আর শোয়ার ঘর গুছিয়ে রাখা—সে তো খুবই ভালো কথা। কিন্তু ঘুমুতে যাওয়ার সময় যে কেউ তাকে প্রত্যেকদিন আদর করবার চেষ্টা করবে শুধু সেটাই তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠলো।

এসব যে তার নিঃসঙ্গ জীবনের কল্পণা-প্রবণতা নয়, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়ার জন্যই সে আমাদের সবাইকে তার বাড়িতে নিয়ে এসেছিলো। সে বললো, "যদি দেখি যে আমার মতো অন্য সবাইও শুনতে পাচ্ছে তার পায়ের শব্দ, এসব শুধুমাত্র আমার কল্পনা নয়, তাহলে এর পর কি করা যায় ভেবে দেখা যাবে। —দাঁড়ান, বাথরুমে কেউ স্নান করছে। শুনতে পাচ্ছেন?"

হ্যাঁ, ঠিক শুনতে পেলাম। কান খাড়া করে শুনলাম আমরা সবাই। সবার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। এমন কি, আমারও মনে হোলো যেন আমার পিঠ বেয়ে বরফ-জলের স্রোত বইছে। সবাই ছুটে গেলাম স্নানের ঘরের দিকে। সুরজিত ভটচায দরজা ঠেলে

ভিতরে ঢুকলো। তার পেছন পেছন আমরা সবাই ঢুকে দেখি, বাথরুমের আলো তো জ্বলছেই, তা ছাড়া বাথ-টাব্ জলে প্রায় অর্ধেক ভর্তি, আর তা ছাড়া ঘর ভরে সাবানের মিষ্টি সৌরভ। কিন্তু কেউ নেই ঘরের ভিতর।

আমরা আস্তে আস্তে বাইরের ঘরে ফিরে এলাম। একটু পরেই শুনতে পেলাম পায়ের শব্দ। স্নানের ঘর থেকে বেরিয়ে আস্তে আস্তে শোয়ার ঘরের দিকে যাচ্ছে।

অসিত সান্যাল তাড়াতাড়ি উঠে দেখতে যাচ্ছিলো। রমেন তাকে থামিয়ে বললো, "ওকে একটু সময় দিন। যাই হোক, আমার ঘরটা যদি একটু গুছিয়ে দেয়, ক্ষতি কি।" —কিছুক্ষণ কেটে যাওয়ার পর বললো, "চলুন, এবার গিয়ে দেখে আসি।"

চা খাওয়ার আগে রমেনের সঙ্গে তার ঘরগুলো ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম আমরা সবাই। পরিষ্কার মনে ছিলো যে শোয়ার ঘরে জামা-কাপড় সব এলোমেলো ছড়ানো ছিলো। এখন গিয়ে দেখি সব ঠিক মতো গুছিয়ে তুলে রাখা আছে আলনার উপর। বেডকভার তুলে ভাঁজ করে একটি চেয়ারের উপর রাখা। একটি নতুন পাট ভাঙা চাদর বিছানার উপর বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

"আমার ভয় করছে," অলকা বোস আস্তে আস্তে বললো, "আমি বাড়ী যাবো।"

"তুমি আমাদের সত্যি সত্যি বোকা বানাচ্ছো না তো," সুরজিত ভটচায জিজ্ঞেস করলো রমেন হালদারকে।

"বিশ্বাস না হয় তো বাড়িতে খুঁজে দেখ কাউকে যদি পাও," রমেন উত্তর দিলো।

আমি, সুরজিত আর অসিত সান্যাল সারা বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখলাম। কাউকে দেখতে পেলাম না। এখন ভাবতে হাসি পায়, কিন্তু তখন সত্যি সত্যি আমারও যেন একটু ভয় ভয় করতে লাগলো।

"রমেন, তোমায় আর এখানে থাকতে হবে না", অরুন্ধতী বললো, "একদিনও না। তুমি আমাদের সঙ্গে চলো। এক্ষুনি। যদ্দিন অন্য বাড়ি পাওয়া না যায় তদ্দিন তুমি আমাদের ওখানেই থাকবে।"

রমেন হাসলো, বললো, "আমার জন্যে ভেবো না, ও আমার কোনো ক্ষতি করবে না, আমার মনে হয়, ও আমার প্রেমে পড়েছে।"

অন্য সময় হলে হয়তো সবাই হাসতাম, এনিয়ে একটু রসিকতাও করতাম তার সঙ্গে। কিন্তু তখন আমাদের মুখ দিয়ে কোনো কথা সরলো না।

অমিত সান্যাল জিজ্ঞেস করলো, "আপনি এখন কি করবেন ভাবছেন?"

"জানিনা, কি করবো", রমেন বললো, "তবে যখন এটুকু জেনে গেলাম যে এসব শুধু আমার কল্পনা নয়, তখন যা হোক একটা কিছু উপায় ভাবতে হবে। এভাবে দিনের পর দিন এরকম হতে থাকলে তো চলবে না।"

তখন ন'টা প্রায় বাজে। আমাদের প্রায় সবারই মনে হোলো এবার বাড়ি ফিরতে হবে। সবাই উঠে পড়লাম। আমরা যখন হলঘরের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি, তখন দেখলাম রমেনের বেড়ালটি খাওয়ার ঘরের দরজায় চুপচাপ বসে আছে।

রমেন তাকে দেখে একটু হেসে বললো, "আপনারা সবাই থাকাতে আজ ওর দুধটুকু দিতে দেরি হয়ে গেল। বেচারী বোধহয় তার দুধের জন্যে বসে আছে।"

অলকা বোস বেড়ালটি কোলে তুলে নিলো। বললো, "বেড়ালটি বেশ দেখতে। একে আমি নিয়ে যাই, কি বলেন রমেনবাবু। এর বদলে আপনাকে আমি একটি বিলিতী কুকুরের বাচ্চা দেবো।"

"আমি রমেনকে আগে বলেছি", বলে উঠলো অরুন্ধতী, "ওকে আমি নিয়ে যাবো।"

ঘরের সন্ত্রস্ত পরিবেশ এদের বিতর্কে আবার হাল্কা হয়ে উঠলো। বেশ মজার লাগলো আমাদের। একটি সামান্য বেড়াল নিয়ে দুটি ভদ্র মহিলার মধ্যে এত তর্ক!

অলকা অরুন্ধতীর কথা কানে তুললো না। রমেনের মানাও শুনলো না। সে বেড়ালটিকে বুকে চেপে ধরে সোজা বাইরের দিকে চললো। বেড়ালটি তার কোল থেকে নামবার চেষ্টা করলো। কিন্তু অলকা ছাড়লো না।

হঠাৎ একটি চিৎকার শোনা গেল অলকার মুখ থেকে। বেড়ালটি অলকার হাত আঁচড়ে দিয়েছে।

অলকার চিৎকার শুনে অমিত সান্যাল তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল তার দিকে, ইতিমধ্যে বেড়ালটিও নেমে পড়েছে অলকার কোল থেকে। অলকার দিকে এগোতে গিয়ে অমিত আচমকা বেড়ালের একটা পা মাড়িয়ে দিলো তার ভারী জুতো দিয়ে। বেড়ালটি করুণ-গলায় ম্যাও ম্যাও করতে করতে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুটে বেরিয়ে গেল।

সামান্য একটুখানি আঁচড় অলকার হাতে। রমেন হালদার টিংচার আইডিন এনে দিলে। অমিত সান্যাল অলকার হাতে টিংচার আইডিন লাগিয়ে দিলো।

আমি হেসে ঠাট্টা করে বললাম, "অলকা এলেন উর্ধ্বলোকের এক জীবের সঙ্গে দেখা করতে আর এখন বাড়ি ফিরছেন হাতে শুধু বেড়ালের আঁচড়ের দাগ নিয়ে।"

সবাই আমার কথা শুনে হাসলো। অমিতের হাতে টিংচার-আইডিন নিয়ে অলকা যেন ওষুধের জ্বালা অনুভব করলো না একটুও।

এমন সময় অরুন্ধতী হঠাৎ বলে উঠলো, "ওই শোনো। পায়ের শব্দ। শুনতে পাচ্ছো?"

আমরাও শুনতে পেলাম। একজোড়া স্লিপারের শব্দ, হলের বাইরে বারান্দা পেরিয়ে, সিঁড়ি ধাপ অতিক্রম করে বাগানে নেমে গেল, তারপর কাঁকরের পথ বেয়ে এগিয়ে আস্তে আস্তে অন্ধকারে মিশে গেল।—কিন্তু এবার আর কোনো যৌবনচঞ্চলা তরুণীর দ্রুত, চঞ্চল, চরণধ্বনি নয়। এবার যেন অনেক কষ্টে হেঁটে যাওয়া। একটি পদক্ষেপ ভারী, একটি হাল্কা। কেউ যেন খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলেছে। আর সেই সঙ্গে একটি অস্ফুট ফোঁপানোর আভাস।

আমরা অলকার দিকে তাকালাম। অলকা আমাদের সবার দিকে তাকালো। তারপর তাকালো নিজের হাতের আঁচড়ের দাগের দিকে। পরমুহূর্তেই "ও বাবাগো" বলে, মূর্ছিত হোলো অলকা বোস, একেবারে অসিত সান্যালের বুকের মধ্যে।

শেষ হোলো পরিমল সেনের আষাঢ়ে গল্প। মজলিশের রুদ্ধশ্বাস পরিবেশ কাটতে সময় নিলো কিছুক্ষণ। বনানীর চাকর যখন আরেক পট চা নিয়ে এলো, আর বাইরে ঝিরঝির করে হাল্কা বৃষ্টি নামলো, বৃষ্টিরই মতো হাল্কা হয়ে গেল সবার মন।

সবাই অসিত চ্যাটার্জী আর বনানী মৈত্রের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলো। শুধু বিভূতি দত্তের মুখ কালো হয়ে গেল।

আষাঢ় শেষ হয়ে শ্রাবণ এলো। একদিন এক বাদলা রোববার সন্ধ্যায় চা-সিঙাড়া-কচুরি নিয়ে জোর আড্ডা জমলো বনানী মৈত্রের বাড়িতে। এমন বাদলা দিনেও কেউ এবাড়ির রোববারের আসর কামাই করতে রাজি নয়। বাইরে তুমুল বর্ষণ। পথের দু'পাশের গাছে গাছে দমকা হাওয়া থেকে থেকে উদ্দাম হয়ে উঠছে। আকাশে

বিজলী ঝলসে উঠেছে বার বার। দুরান্ত যন্ত্রনির্ঘোষের প্রতিধ্বনিতে কেঁপে কেঁপে উঠছে জানলার সার্সি।

সেদিনের আসরে যোগ দিয়েছিলেন বনানীর দাদামশাই রাজকুমার ভাদুড়ি। তিনি বেশির ভাগ সময় থাকেন জলপাইগুড়িতে। সম্প্রতি কলকাতায় বেড়াতে এসেছেন। অনেক বয়েস, মাথায় সাদা চুল, মুখ জুড়ে সাদা গোঁফ, এই বয়েসেও অটুট স্বাস্থ্য।

তাঁকে মঞ্জু লাহিড়ি বলেছিলো, "আমরা সবাই রোববার সন্ধ্যাবেলা এখানে জড়ো হই। বনানী আমাদের চা-কচুরি খাওয়ায় আর প্রত্যেকরই এক একদিন পালা করে একটি গল্প বলে, যা শুনে মনে হবে অসম্ভব বা অবাস্তর, কিন্তু হয়তো বা সত্যি সত্যি হয়ে থাকবে। আমরা শুনতে শুনতে শিউরে উঠি, চমকে যাই বা ভয়ে জমে যাই, আরো দু-তিন কাপ চা খাই, তারপর বাড়ি ফিরে গিয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখি। কিন্তু ঝড় হোক, বাদলা হোক, বৃষ্টি হোক, যাই হোক, প্রত্যেক রোববার সন্ধ্যাবেলা এখানে কেউ গাফিলতি করি না।"

মঞ্জুর কথা শুনে ভাদুড়ি মশাই কোঁচার খুঁট দিয়ে গোঁফের প্রান্ত থেকে একটি শিঙ্গাড়ার টুকরো ঝেড়ে ফেললেন। তারপর বললেন, "বেশ তো, তোমরাই একজন কেউ গল্প বলো না। আমি শুনি। আমায় আর কেন গল্প বলতে বলছো।"

"আপনি এত নাম করা শিকারি ছিলেন এককালে," বললো কান্তি চৌধুরী, "আপনার নিশ্চয়ই কিছু না কিছু অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়ে থাকবে। কিংবা হয়তো শুনে থাকবেন কোনো না কোনো অবিশ্বাস্য ঘটনা।"

ভাদুড়ি মশাই গড়গড়ার নল তুলে নিলেন। একটু ভেবে আস্তে আস্তে বললেন, ও রকম অনেক কিছু যে শুনিনি তা নয়। তবে যা আমি নিজেই বিশ্বাস করতে পারিনি, তা আর আমি তোমাদের বিশ্বাস করানোর মতন করে বলবো কেমন করে। তবে হ্যাঁ, একবার

আমার একটা আশ্চর্য অভিজ্ঞতা হয়েছিলো যেটা ভাবতে গেলে আজো আমার গায়ে কাঁটা দেয়। সে ঘটনা জীবনের শেষ দিন অবধি মনে থাকবে।"

বাড়ীর ছাদের উপর তখন মুষলধার বৃষ্টির অবিরাম ছন্দ বেজে চলেছে। রাস্তার আবছা-নীল গ্যাস লাইটের আলোর ওপারে কেঁপে কেঁপে উঠছে জমাট অন্ধকার। নির্জন পথ দিয়ে ঘন্টি ঠুন ঠুন করে চলে গেল একটি খালি রিক্শা। কাছাকাছি কোথায় একটি পথচারী কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠলো।

রাজকুমার ভাতুড়ির চোখ ছুটো পুরানো কথা মনে পড়ায় আমেজে প্রায় বুঁজে এলো। গড়গড়ায় একটি দীর্ঘ টান দিয়ে তিনি চোখ খুলে আমাদের দিকে তাকালেন।

"পঁচিশ বছর আগেকার কথা", সুরু করলেন ভাতুড়ি মশাই। "দক্ষিণে ক্যানিং লাইনের ওধারে যেই গাঁগুলো আছে সেগুলো ছাড়িয়ে গেলে যেই বিল আর জলা ছড়িয়ে আছে বহুদূর অবধি, সে সব জায়গায় সেকালে এখনকার চাইতে অনেক বেশী পাখী দেখা যেতো। আমরা প্রায়ই পাখি শিকার করতে যেতাম সেখানে। একবার কাঁধে বন্ধুক ঝুলিয়ে আমি আমার এক বন্ধু রাজেন গাঙ্গুলী গিয়ে উপস্থিত হলাম মিহিরপুর নামে এক গণ্ডগ্রামে। আমরা সেখানে গিয়ে পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গেই তুমুল বৃষ্টি সুরু হোলো,—আজ যে রকম বৃষ্টি হচ্ছে ঠিক তেমনি। সবাই আমাদের বললে যে আবহাওয়া পরিষ্কার না হয়ে গেলে পাখি শিকারের কোনো রকম আশা করা বৃথা।

তক্ষুনি আবার কলকাতায় ফিরে আসার ইচ্ছে একেবারেই ছিলো না। স্থির করলাম, সেখানে কয়েকদিন থাকবো। সেখানকার স্কুলের এক মাষ্টার ছিলো। তার নাম রামলোচন আঢ্যি। তার

খুড়তুতো ভাই আমাদের সঙ্গে এককালে কলেজে পড়তো। আমরা তারই বাড়ীতে অতিথি হলাম।

সেদিন রাত্তিরে রাম আট্যির ঘরে তারই সঙ্গে আমাদের শোয়ার ব্যবস্থা হোলো। রামলোচন খুবই অতিথিবৎসল লোক। খুব আমুদে। চমৎকার গল্প করতে পারে। খাওয়া-দাওয়া হৈ-চৈ করে একটি চমৎকার বাদলা সন্ধ্যা কাটলো। কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার পর দেখলাম রামলোচনের আমুদে মেজাজ হঠাৎ উবে গেল। সে খুব বিমর্ষ আর গম্ভীর হয়ে গেল। মনে হোলো হঠাৎ কোনো ব্যাপারে সে খুব দুর্ভাবনাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। আমরা শুতে যাওয়ার আগে সে হঠাৎ আমাদের বললো, কেউ যদি রাত্তিরে আমাদের নাম ধরে ডাকে, সে ডাক খুব পরিচিত লোকের মনে হলেও আমরা যেন তিন ডাকের আগে সাড়া না দিই।

আমরা একটু বিস্মিত হলাম। ভেবে পেলাম না কেনই বা এই অচেনা অপরিচিত জায়গায় রাত দুপুরে কেউ আমাদের নাম ধরে ডাকবে। রামলোচন আমাদের প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে বললো পরদিন সকালে সে আমাদের সবই খুলে বলবে। যাই হোক, আমরা আর কিছু জিজ্ঞেস না করে চুপচাপ শুয়ে পড়লাম।

সেদিন নিশুতি রাতে সমস্ত গ্রাম যেন নিঝুম হয়ে পড়ে রইলো। শুধু দু-চারবার শেয়াল ডাকলো অনেক দূরে দূরে। তা-ছাড়া কোন দিক থেকে কোনো শব্দই শোনা গেল না। সব বাড়িগুলো অন্ধকার, নিস্তব্ধ। তবে তাতে কিছুই মনে হোলো না, কারণ পাড়াগাঁ অঞ্চল রাত্তিরে খুব চুপচাপ, নিরিবিলিই থাকে। শুধু বাঁশবনে একটানা ঝিরঝির বৃষ্টির শব্দ। থেকে থেকে শুধু ব্যাঙ ডাকছে আর আমগাছে আর বটগাছে হাওয়া দিয়ে যাচ্ছে আর মাঝে মাঝে অন্ধকার ভেদ করে প্যাঁচার ডাক ভেসে আসছে। এমন কি গাঁয়ের কুকুরগুলোও একেবারে চুপচাপ।

যখন মাঝরাত্তির এবং কাঁটায় কাঁটায় বারোটা—আমার পরিষ্কার মনে আছ কারণ শোয়ার ঘরে রামলোচনের ঠাকুর্দার আমলের ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজা ঠিক শেষ হোলো তখন—একটা গম্ভীর উদাত্ত গলার সাড়ায় হঠাৎ রাত্তিরের সেই স্তব্ধতা ভাঙলো। সে গলার ঠিকমতো বর্ণনা আমি দিতে পারবো না। সে গলা নরম, তীক্ষ্ণ কিন্তু আশ্চর্য মোহময়। যে নাম সে ডাকলো সে আমার পরিষ্কার মনে আছে। শুনলাম সে ডাকছে,—"ব-লা-ই-চ-র-ণ... !—"

সেই ডাকে কি যেন ছিলো, শুনে আমার সারা শরীর হিম হয়ে গেল। আমি চোখ খুলে অন্ধকারের মধ্যে দেখবার চেষ্টা করলাম। মনে হোলো যেন রাজেনও বিছানার উপর উঠে বসেছে। সঙ্গে সঙ্গে একটা চাপা চিড়চিড় শব্দ কানে এলো। শুনতে পেলাম রামলোচন চাপা গলায় দুর্গা নাম জপ করছে।

"ব্যাপার কি ?" রাজেন জিজ্ঞেস করলো।

"কোনো কথা বলবেন না," রামলোচন ফিসফিস করে বললো, "কাঁথামুড়ি দিয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকুন।"

আমি বিছানা থেকে উঠে পড়ে জানলার দিকে এগিয়ে গেলাম। জানলাটা বন্ধ ছিলো। রামলোচন তার বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে এসে আমার পথ আটকে দাঁড়ালো। চাপা গলায় বললো, "কী গোঁয়ার্তুমি করছেন। চুপ করে শুয়ে পড়ুন।"

"কিন্তু ব্যাপারটা কি," আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"ও ব্যাপার রাত্তিরে বলা যায় না," সে উত্তর দিলো।

গাঁয়ের লোকের যতো সব আজেবাজে কুসংস্কার, আমি ভাবলাম। তর্ক করে রামলোচনের মনে কষ্ট দিতে ইচ্ছে হলো না। কোনো কথা না বলে আবার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু তখন অদ্ভুত লাগছিলো সমস্ত ব্যাপারটা। কান খাড়া করে রইলাম যদি আবার শুনতে পাই। সমস্ত গ্রাম জুড়ে সেই স্তব্ধতায় যেন একটা

ভয়ের আমেজ। বাইরের হাওয়াও যেন শ্বাস বন্ধ করে আছে। তুমুল বৃষ্টিও যেন সুর নামিয়ে ফিকে হয়ে এসেছে।

এমনি সময় শুনতে পেলাম পায়ের শব্দ। কানে পরিষ্কার ভেসে এলো। এ শব্দ খুব ভারী পায়ের, বাইরের পথের কাদা আর জল ভেঙে যেন আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে। সে পায়ের শব্দ আস্তে আমাদের দোতলার শোয়ার ঘরের জানলার নিচে দিয়ে পেরিয়ে গেল। যাওয়ার সময় ডেকে গেল,—রা-ম-লো-চ-ন...।

ঘরের ভেতরটা যেন বরফের মতো জমে গেল। রামলোচনের দুর্গানাম জপও আর শোনা গেল না। সেই গম্ভীর গলায় কে যেন ডাকলো—রা-ম-লো-চ-ন !

রাজেন আর বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে জানলার দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু রামলোচন তাকে জাপটে ধরলো পেছন থেকে।

"না, না ভাই যাবেন না, দোহাই আপনার," সে বললো ফিসফিস করে। তাকে সে টেনে বিছানায় নিয়ে গেল।

জল-কাদা ভেঙে পথ চলার সেই ভারী পায়ের আওয়াজ আস্তে আস্তে দূরে মিলিয়ে গেল। কমে-আসা বৃষ্টি আবার সুর চড়িয়ে তীব্র মুষলধারে নামলো। একটি কুকুর ডেকে উঠলো অনেক দূরে। অনেক দূরের ধান ক্ষেতে একটি বাজ পড়লো প্রবল গর্জন করে। উন্মাদ হওয়া বার বার ঘা দিয়ে যেতে লাগলো জানলায় দরজায়। তুমুল বর্ষণ বাড়ির টিনের চালে একটানা বেজে চললো নির্মমভাবে।

আমি অনেকক্ষণ জেগে জেগে ভাবলাম এই রহস্যের মতো আশ্চর্য গা-হিম করে দেওয়া ডাকের কথা। বেশ বুঝতে পারলাম যে রাজেনও জেগে এই একই কথাই ভাবছে। বাইরে খুব বৃষ্টি, বৃষ্টি আর বৃষ্টি। আস্তে আস্তে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে আকাশ বেশ পরিষ্কার হয়ে গেল। চারদিকে বেশ ঝরঝরে হাল্কা রোদ্দুর। আকাশে শুধু কয়েক টুকরো গোলাপী

আর সাদা মেঘ। গাছে গাছে অনেক পাখি।—শুধু পথে কাদা আর জল।

রামলোচন আঢ্যির খুব খুশী-খুশী ভাব। আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম আগের দিন রাত্তিরের ব্যাপারটার সম্বন্ধে। দিনের আলোয় বেশ খোশমেজাজে একথাও জিজ্ঞেস করতে পারলাম যে রাত্তিরের সেই লোকটি কোনো বদমেজাজী পাওনাদার কিনা, যার পাওনা টাকা আদায় করবার একটা নিজস্ব পদ্ধতি আছে।

উত্তরে রামলোচনের কাছে যা শুনলাম একেবারে বিশ্বাস করবার মতো নয়।

সে বললো,—আমরা যা শুনেছি, সেটা হোলো নিশির ডাক।

নিশির ডাক ব্যাপারটা কি জানো? শহরের মাঝখানে বসে ভাবা যায় না এ কতো ভয়াবহ ব্যাপার, কিন্তু গাঁয়ের লোকে শুনলে ভয়ে জমে যায়, সে যতো সাহসীই হোক না কেন। এ নাকি কোনো মন্ত্রসিদ্ধ শক্তিমানের ডাক যে অন্য লোকের আত্মাকে ডেকে বার করে নিয়ে যায় নিজের প্রয়োজনে। সে নাকি এক মন্ত্রপূত হাঁড়ি নিয়ে রাত্তিরে বেরোয় কারো আত্মাকে বন্দী করবার জন্যে। যার আত্মাকে সে চায় তার বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে যেতে তার নাম ধরে ডাকে। যাকে ডাকা হয়, তার অনেক সময় মনে হয় এ যেন খুব চেনা লোকের গলা। সে-ডাক এত পরিষ্কার, এত স্পষ্ট যে, সে লোক জেগে থাকুক ঘুমিয়ে থাকুক, তার কানে সে-ডাক পৌঁছোবেই।

সে যদি ডাক শুনে সাড়া দেয় তো তার হয়ে গেল। তার আত্মা তক্ষুনি তার শরীর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে, বেরিয়ে এসে আবদ্ধ হয় সেই মাটির হাঁড়িতে। কিন্তু সব অলৌকিক ব্যাপারের মতো এর মধ্যেও একটা ফাঁক আছে। নিশি ডাকে তিনবার। তিন ডাকে যদি কেউ সাড়া না দেয় তো সেই নিরাপদ। তার আত্মাকে কেউ বন্দী করতে পারে না। তাই পাড়াগাঁয়ে কেউ তিন ডাকে সাড়া

দেয় না, তিন ডাকের পর সাড়া দেয়। আজকাল অবশ্যি এসব ব্যাপার কেউ বিশ্বাস করে না, কিন্তু তখনকার দিনে লোকে এসব খুব বিশ্বাস করতো।

এই গাঁয়ে রাত্তিরে এই ডাক শোনা যাচ্ছিলো প্রায় মাসখানেক ধরে। রামলোচনের কাছে থেকে জানা গেল যে ডাকে সাড়া দিয়ে এ পর্যন্ত তিনজন চিরজীবনের মতো স্তব্ধ হয়ে গেছে। সারা গাঁ জুড়ে ভয় আর আশঙ্কা। "কিন্তু শুধু তিনজনে তার প্রয়োজন মেটে নি," রামলোচন বলে গেল, "তাই সে প্রত্যেক রাত্তিরে ফিরে ফিরে আসে, এসে ডেকে যায় এক একজনের নাম ধরে, যদি কেউ ভুল করে সাড়া দেয় তার ডাকে। আর আমরা বালিশের নিচে প্রসাদী-ফুল রেখে ঠাকুর দেবতার নাম করে শুতে যাই। আপনারা নতুন এসেছেন। তাই আপনাদের এসব জেনে রাখা দরকার, যদি সে আপনাদেরও নাম ধরে ডাকে আপনারা যেন সাড়া না দেন।"

"কিন্তু সে আমাদের নাম জানবে কি করে?" রাজেন জিজ্ঞেস করলো।

"ওঁদের ক্ষমতা আছে, ওঁরা ঠিক জানতে পারেন," রামলোচন উত্তর দিলো।"

"কিন্তু সে লোকটি কে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। "ওকে পাকড়াও করে কষে ধোলাই দিলেই হয়।"

রামলোচন আমার কথা শুনে শিউরে উঠলো। বললো, "ও কে আমরা জানি না। জানলেও, আপনি যা বলছেন, সেটা সম্ভব নয়। ওঁদের অলৌকিক ক্ষমতা, আমরা পেরে উঠবো কি করে?"

আমরা অবশ্যি রামলোচনের গল্প একটুও বিশ্বাস করলাম না। আমরা প্রচুর হাসলাম। আমাদের হাসতে দেখে সে একটু আহত হোলো।

"নিশির ডাক" রাজেন হাসতে হাসতে বললো, "কী মিষ্টি রোমান্টিক শুনতে। ভাবতেই আমার মন দুলে উঠছে।"

যাক, এ নিয়ে আমরা আর বেশী মাথা ঘামালাম না। আমরা পাখি শীকার করতে এসেছি, পাখি শীকার করে চলে যাবো, সুতরাং আমরা বসে রইলাম আবহাওয়া আরো পরিষ্কার হওয়ার অপেক্ষায়। কিন্তু সকাল বেলা যেটুকু ভরা রোদ্দুর ছিলো, দুপুর হতে না হতে আকাশে আবার অন্ধকার হয়ে বৃষ্টি নামলো। পাড়াগাঁ অঞ্চলের এই একটানা বৃষ্টিতে এমন একটা সুর থাকে, সব শুনে সারাদিন আর কিছু করতে ইচ্ছে করে না। খোলা জানলার পাশে বসে, কলা-বাগানের অনেক ওপারে ধানক্ষেতের দিকে তাকিয়ে শুধু মনে পড়ে ছেলেবেলার ছড়াগুলো আর তাই ভাবতে ঘুম পেয়ে যায়।

মেঘে মেঘে বিকেল গড়িয়ে গেল। আমরা শুধু বসে বসে প্রচুর চা খেলাম, আমাদের আর কিছু করবার ছিলো না। কিছুক্ষণ পরে আমি আর রাজেন বসে একটা মতলব আঁটলাম। ভাবলাম, এখনকার মতো যখন পাখি শীকারের কোনো সম্ভাবনা নেই, তখন গাঁয়ের লোকের একটু উপকার করা যাক। এরা এমন অতিথিবৎসল, এদের একটু উপকার করে যেতে পারলে ক্ষতি কি? আমরা স্থির করলাম, সেদিন আমরা রাত জেগে এই নিশির ডাকের রহস্যভেদ করবার চেষ্টা করবো, দেখবো যদি এই গাঁয়ের লোককে তাদের প্রত্যেক রাত্তিরের দুঃস্বপ্নের হাত থেকে রেহাই দিতে পারি।

রামলোচনকে আমরা কিছুই জানালাম না। আমরা ঠিক করলাম যে রাত্তিরে সবাই যখন ঘুমিয়ে থাকবে, আমাদের মধ্যে একজন বাইরে এসে কোথাও লুকিয়ে বসে থাকবো আর লোকটা এলে ধরে ফেলবো তাকে। অন্যজন ঘুমিয়ে থাকবে, দরকার হলে তাকে জাগানো হবে। আমরা পালা করে প্রত্যেক রাত্তির জাগবো।

প্রথম রাত্তিরে রাজেন শুতে গেল। আমি আমার বন্দুক নিয়ে চুপচাপ বাইরে বেরিয়ে এলাম। বৃষ্টি তখন থেমে গেছে। একটি ফিকে চাঁদ উঁকি মারছে টুকরো টুকরো মেঘের ফাঁক দিয়ে। সেদিন বেশ খানিকটা গরম। বাইরে খোলা হাওয়ায় বেরিয়ে এসে আমার ভালোই লাগছিলো। রামলোচনের বাড়ির সামনে একটি ফাঁকা গোয়াল ঘরে আমি জেগে বসে রইলাম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল। যে লোকটা নিশি ডেকে যায় তার দেখা নেই। কাছাকাছি কোথাও জল-কাদা ভেঙে চলার শব্দও পাওয়া গেল না। শুধু শেয়ালের ডাক শোনা গেল দূরের ঝোপঝাপ থেকে, মাঝে মাঝে কুকুরের ডাক শোনা গেল আশে পাশে, খানা ডোবার ওধার থেকে ভেসে এলো ব্যাঙের ডাক আর অন্ধকারের ভিতর থেকে ঝিঁ ঝিঁ পোকার শব্দ।

তার পরদিন লক্ষ্য করলাম গাঁয়ের লোকজন খুবই বিস্মিত হয়েছে আগের দিন রাত্তিরে নিশির ডাক না শুনে, কারণ ডাক শোনা যেতো প্রত্যেক রাত্তিরে। কিন্তু বিকেলের মধ্যেই সবাই জেনে গেল আমাদের মতলব। রাত্তিরে কেউ হয়তো জানালা দিয়ে উঁকি মেরে আমায় দেখতে পেয়েছিলো। তারই কাছ থেকে কথাটা ছড়িয়ে গেল। খুব শঙ্কিত আর উত্তেজিত হয়ে উঠলো পাড়ার লোকজন। প্রত্যেকেরই মনে ভয়। রামলোচন হাত জোড় করে আমাদের সাধাসাধি করতে লাগলো আমরা যেন এরকম গোঁয়ার্তুমি না করি।

কিন্তু আমরা ওর কোনো কথাই শুনবো না।

সেদিন রাত্তিরে রাজেনের রাত জাগার পালা। আমি শুয়ে পড়লাম। রামলোচন এমন ভয় পেয়ে গেল যে সে আমার সঙ্গে একঘরে শুতেই রাজী হোলো না। সে শুতে গেল অন্য ঘরে। সেদিন রাত্তিরেও আকাশে খুব মেঘ আর বাইরে খুব ঝড়। কিন্তু

বৃষ্টি হোলো না, নিশিও ডাকলো না, শোনা গেল না গাঁয়ের পথের কাদা ভেঙ্গে চলা কোনো রহস্যময়ের পথশব্দ।

ছয় রাত্তির ধরে চললো আমাদের সজাগ পাহারা। আমি আর রাজেন পালা করে এক একদিন রাত জেগে রইলাম। কিছুই দেখতে পেলাম না, কিছুই শুনতে পেলাম না। আমরা ক্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। এক ঘেয়ে লাগতে লাগলো আমাদের। রহস্যভেদ করবার শখও উবে গেল আস্তে আস্তে। স্থির করলাম যে, আর এক রাত দেখবো, তারপর বাক্সবিছানা নিয়ে ফিরে যাবো কলকাতা।

সেদিন রাত্তিরে আমার পালা। সে আবার এক বাদলা ঝোড়ো রাত। কোথাও কোনো শব্দ নেই, শুধু রাত্তিরে টিনের চালের উপর আর বাইরের শুকনো পাতার উপর অবিরাম বৃষ্টির আওয়াজ আর গাছে গাছে হাওয়ার শব্দ। জট পাকিয়ে যাওয়া কালো ডালপালার ফাঁকে ফাঁকে ঘন ঘন বিজলীর আর সঙ্গে সঙ্গে মেঘের ডাকে ডাকে বাজ পড়ার সাংঘাতিক গর্জন। কাদায় ভরা পথের পাশে ফাঁকা গোয়াল ঘরে একলা বসে আমি ঝিমোতে লাগলাম।

কতক্ষণ কেটে গেল জানিনা। হঠাৎ আমি চমকে উঠে বসলাম। শুনতে পেলাম অনেকটা দূরে কাদা ভেঙ্গে একটা ভারী পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে। আমি আমার বন্দুক তুলে নিয়ে গোয়াল ঘরের দরজার আড়ালে এসে দাঁড়ালাম। পায়ের শব্দ আস্তে আস্তে কাছে কাছে এগিয়ে এলো। আস্তে আস্তে আরো কাছে, আস্তে আস্তে অনেক কাছে। তারপর হঠাৎ অন্ধকারের ভিতর থেকে পথের ঠিক মাঝখানে আবির্ভূত হোলো এক দীর্ঘ সুঠাম পুরুষের ছায়ারেখা। হাতে তার একটি মাটির হাঁড়ি।

আমি ডেকে জিজ্ঞেস করলাম—কে ওখানে? সে আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়ালো। তখন ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছে। আমরা কেউ

কাউকে পরিষ্কার দেখতে পেলাম না। কি জানি কেন হঠাৎ আমার সারা শরীরে শিহরণ বয়ে গেল। আমি ভয়ে কেঁপে উঠলাম। কি কি করছি বুঝে উঠবার আগেই বন্দুকের ট্রিগার টিপলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে বিপুল গর্জন করে বাজ পড়লো কাছাকাছি কোথাও, আর তারই দীর্ঘ প্রতিধ্বনির রেশে ডুবে গেল বন্দুকের আওয়াজ।

বন্দুকের গুলি তার গায়ে লাগেনি। মাটির হাঁড়িটা পথের মাঝখানে ফেলে সে পালিয়ে অন্ধকারের মধ্যে মিশে গেল। আমি ছুটে বাইরে বেরিয়ে এসে পথ ধরে খানিকটা এগিয়ে গেলাম। মনে হোলো এত রাত্তিরে, এই অন্ধকারে, এরকম একটা অচেনা জায়গায় তার পিছু নেওয়া আমার পক্ষে নিরাপদ নাও হতে পারে। আমি ফিরে এলাম, দেখলাম পথের মাঝখানে হাঁড়িটা পড়ে আছে। তার মুখে একটি ঢাকনা। কাদার উপর পড়েছে বলে সেটা ভাঙেনি। সে জায়গাটা রাজেন যে ঘরে ঘুমিয়েছে সে ঘরের জানলার ঠিক নিচে।

আমি মাটির হাঁড়িটা তুলে নিয়ে ঢাকনাটা তুললাম। আর সঙ্গে সঙ্গে হাঁড়ির ভেতর থেকে একটা তীব্র দুর্গন্ধ আমার নাকে লাগলো। গা-বমি করে উঠলো আমার আর মাথাটা ঘুরে উঠলো। মনে হোলো যেন এক্ষুনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবো। কোনো একটা কিছু ধরে দাঁড়াবার জন্যে এদিক ওদিক একটু হাতড়ে, চিৎকার করে ডাকলাম—"রা-জে-ন...!"

সঙ্গে সঙ্গে রাজেনের উত্তর শুনতে পেলাম, "কি ? কি হয়েছে ? দাঁড়াও, এক্ষুনি আসছি।" আমার চারদিক দুলে উঠলো। মনে হোলো যেন রাজেনের গলা ভেসে আসছে অনেক দূর থেকে। তার গলার শব্দ আস্তে আস্তে অনেক দূরে মিলিয়ে গেল। আমি আর কিছু বলতে গেলাম না। বৃষ্টি আর হাওয়ার শব্দ, ঝিঁ ঝিঁ পোকার আওয়াজ, ব্যাঙের ডাক সব কিছু আমার কাছে থেকে

অনেক দূরে মিলিয়ে গেল, আমার চারিদিকে রইলো একটা মৃত্যু-শীতল স্তব্ধতা।

আমার জ্ঞান ফিরলো তারপরদিন সকাল বেলা। চোখ মেলে দেখি শুয়ে আছি আমারই বিছানায়। আমার গায়ের উপর একটি কম্বল চাপানো। ঘরের মধ্যে আরো কয়েকজন লোক। তাদের সবারই মুখে শোক, ভয় আর উৎকণ্ঠা আমি চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম। কিন্তু আমার চোখে যাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলো তাকে দেখা গেল না।

"রাজেন কোথায়?" আমি আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলাম। ওরা সবাই এর ওর দিকে তাকালো। তারপরই রামলোচন ধরা গলায় খবরটা ভাঙলো।

আগের দিন রাত্তিরে ওরা নিশির ডাক শুনতে পেয়েছিলো। সে ডাক ডাকলো রাজেনের নাম ধরে। আর সে গলা শুনে তাদের পরিষ্কার মনে হয়েছিলো সে যেন আমারই গলা। রাজেন সাড়া দিয়েছিলো সেই প্রথম ডাকেই। সকাল বেলা ওরা এসে দেখলো রাজেনের প্রাণহীন দেহ ঘরের মধ্যে পড়ে আছে।

* * * *

বনানীর দাদামশাই রাজকুমার ভাদুড়ির গল্প শুনতে শুনতে সবারই কাপের চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

বাইরে বিপুল ঝড় তখন বার বার করাঘাত হানছে ঘরের দরজায় আর জানালায়। বাগানের ওধারে লোহার গেট দমকা হাওয়ায় বার বার আর্তনাদ করে উঠছে।

"সেদিনের সেই রাত ছিলো আজকেরই মতো এক পাগলা ঝড়ের রাত," বললো বুড়ো ভাদুড়ি মশাই, "আর সে রাত আজো আমার ঘুমের মধ্যে দুঃস্বপ্ন হয়ে ফিরে ফিরে আসে।"

অসিত চ্যাটার্জী ইতিমধ্যে বনানীর সঙ্গে আরো বেশী অন্তরঙ্গ হয়ে পড়লো। অন্যান্য সব অল্পবয়সীদের মতো এমন একটি অন্তরঙ্গতা, যেটা ওদের ধারণা আর কেউ লক্ষ্য করছে না অথচ লক্ষ্য করছে সবাই কিন্তু মুখে কিছু বলছে না।

একদিন রোববারের আসরে সবাই জমায়েত হতে প্রফেসার বোস হঠাৎ অসিতকে বললো, "কাল আপনাকে আর বনানীকে দেখলাম লাইট হাউসে। আমি আপনাদের ডাকতে যাচ্ছিলাম কিন্তু তার আগেই আপনি আর বনানী ভিড়ের মধ্যে এমন মিশে গেলাম যে আর খুঁজে পেলাম না।"

বনানীর দিদি মঞ্জু লাহিড়ি একবার অসিতের দিকে আরেকবার বনানীর দিকে তাকালো। কারণ বনানী মঞ্জুকে বলেছিলো যে আগের দিন সন্ধ্যাবেলা সে তার এক অসুস্থ বন্ধুকে দেখতে গিয়েছিলো। মঞ্জু মুখে কিছু জিজ্ঞেস করলো না, একবার তাকালো বিভূতি দত্তের দিকে। কারণ অসিত চ্যাটার্জী সঙ্গে এদের পরিচয় হওয়ার আগে বিভূতি দত্তের সঙ্গেই বনানীর মাখামাখি বেশী।

বিভূতি অনুভব করলো মঞ্জুর দৃষ্টি, শুধু মঞ্জুর নয়, আরো অনেকের অর্থপূর্ণ দৃষ্টিও, কিন্তু সে স্মার্ট ছেলে, কোনোরকম ভাব প্রকাশ করলো না, বরং ব্যাপারটা একটু সহজ করে দেওয়ার জন্যে হাল্কা ভাবে বললো, "কাল সিনেমায় যাওয়ার ইচ্ছে ছিলো আমারও। কিন্তু দুপুরে এমন ঘুমোলাম যে ঘুম ভাঙলো সন্ধ্যের পর।—ও হ্যাঁ, কাল একটা মজার স্বপ্ন দেখেছি। আমি একটি মহিলার সঙ্গে যাচ্ছিলাম সিনেমায়। মহিলার চেহারা আমার মনে নেই। বাড়ি থেকে যখন বেরোবো এমন সময় আরেকজন ভদ্রলোক এলো। ওর চেহারাও আমার মনে নেই। একটু মনে আছে যে সে ভদ্রলোক আমায় একটি চকলেট খেতে দিলো সেটা আসলে ঘুমের ওষুধ সেটি খেয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। তখন আমায় একলা

ফেলে ওরা দুজন সিনেমা দেখতে চলে গেল। এখন মনে হচ্ছে হয়তো ওরা দুজন অসিত আর বনানী।"

বিভূতির স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনে কারোই এমন কিছু হাসি পেলো না। তবু সবার যেন মনে হোলো একটু হাসা উচিত। সুতরাং সবাই হাসলো।

অপূর্ব লাহিড়ি অসিতকে বললো, "আপনি তো সাইকলজিস্ট। বিভূতির স্বপ্নের একটা মনোস্তাত্বিক ব্যাখ্যা করুন না শুনি।"

"সবার সামনে?" অসিত ভালো মানুষের মতো মুখ করে বললো। এবার হেসে ফেললো সবাই।

"স্বপ্ন কি কখনও সত্যি হয়?" মীনা সেন জিজ্ঞেস করলো।

কান্তি রায় চৌধুরী বললো, "সত্যি হওয়ার জন্যে তো স্বপ্ন নয়, স্বপ্ন শুধু স্বপ্ন। মাঝে মাঝে হয় তো দেখা যায় একজন যা স্বপ্নে দেখলো, পরে সেটা হতেও দেখা গেল, কিন্তু এ শুধু একটা আকস্মিক সংগঠন মাত্র, একটা কাকতালীয় ব্যাপার, একটার সঙ্গে আরেকটার কোনো সম্পর্ক নেই। তবে হ্যাঁ, আমি একটা ঘটনা জানি, তাতে একজন ভদ্রলোকের সমস্ত অদ্ভুত স্বপ্ন আশ্চর্যভাবে সত্যি হতে দেখা গিয়েছিলো।"

পরিতোষ বললো, "আজ তাহলে আপনার গল্পটাই শোনা যাক।"

"নিখিল ঘোষের নাম আপনাদের মনে আছে?"—কান্তি রায় চৌধুরী এ্যাশট্রেতে সিগারেটের ছাই ঝেড়ে জিজ্ঞেস করলো। "—মনে থাকবার কথা নয়। সে অনেকদিন আগেকার কথা। আমি তখন কলেজে পড়ি। তখন কন্যাকুমারী ব্যাঙ্ক নামে একটি ব্যাঙ্ক ছিলো। সেই ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টার ছিলো। নিখিল ঘোষ নামে এক অর্থবান ভদ্রলোক। সেই ব্যাঙ্ক অনেকদিন হোলো উঠে গেছে।

নিখিল ঘোষের ছোটো ভাই অনিল ঘোষ কলেজে আমার সহপাঠী ছিলো। আমি প্রায়ই ওদের বাড়ি যেতাম। সেখানেই আমার পরিচয় হয় নিখিল ঘোষের সঙ্গে।

বেশ বয়স্ক লোক, কলকাতার ব্যবসায়ী মহলে খুব সুপরিচিত। কিন্তু সাফল্য ঐশ্বর্য তাঁর মধ্যে কোনোরকম আত্মম্ভরিতা আনেনি। উনি প্রায়ই আমার আর অনিলের সঙ্গে বসে গল্প করতেন, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বা অন্য কোনো বিষয়ে আলোচনা করতেন। বয়সের পার্থক্য সত্ত্বেও ওর সঙ্গ আমাদের বেশ ভালো লাগতো। নানাবিষয়ে তাঁর অগাধ পড়াশুনো করা ছিলো এবং তিনি যা বলতেন সেসব খুব পাণ্ডিত্যপূর্ণ হলেও খুব উপভোগ করতাম।

একবার তাঁর খুব শক্ত অসুখ হলো। যদ্দূর মনে পড়ে তাঁর হয়েছিলো টাইফয়েড। প্রথমদিনকার খারাপ অবস্থা কাটিয়ে তিনি যখন একটু ভালো হওয়ার দিকে তখন একদিন তাঁকে দেখতে গেলাম। দু-চার কথার পর তিনি অনিলকে কি একটা কাজে বাইরে পাঠালেন। নার্সকেও বললেন এক কাপ হরলিক্স্ করে আনতে। ঘরে যখন আমি আর উনি একা, তখন আমায় চেয়ারটা টেনে কাছে এসে বসতে বললেন।

"তোমায় একটা অদ্ভুত ব্যাপার বলবো," তিনি আস্তে আস্তে বললেন আমায়, "কাল রাত্তিরে একটা স্বপ্ন দেখেছি।"

তাঁর কথা বলবার ধরণ খুব স্বাভাবিক মনে হলো না। মনে হোলো, হয়তো বা অসুখের দরুণই এরকম হয়েছে। তবু মুখে একটা সহানুভূতি ও আগ্রহের ভাব ফুটিয়ে তাঁর কথা শুনতে আগ্রহান্বিত হওয়ার ভান করলাম।

"আমার এক পিসতুতো ভাই থাকে পার্ক সার্কাসে," বললেন নিখিল বাবু। "তার নাম অনাদি মিত্র। ছেলেবেলা থেকেই আমরা খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু। তার বিষয়ে একটা খুব খারাপ স্বপ্ন দেখেছি কাল

রাত্তিরে। দেখলাম তাকে যেন কেউ গলা টিপে মেরে ফেলেছে। ওর ঠিকানাটা লিখে নাও। গিয়ে দেখে এসো ও কিরকম আছে। আমার মনটা খুব খারাপ হয়ে আছে।"

আমি সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলাম। বললাম, "এ, তো শুধু স্বপ্ন। স্বপ্ন আবার কবে সত্যি হয়। এ সব নিয়ে ভাবতে নেই", ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমার কথা শুনে তিনি একটু হাসলেন। বললেন, "স্বপ্নের মধ্যে সব চেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার কি দেখলাম জানো? দেখলাম, যে হাত দুটো অনাদির গলা টিপে তাকে মেরে ফেলেছে, সে-হাত দুটো আমারই।"

যে ভাবে তিনি বললেন তাতে আমার মুখ দিয়ে কথা সরলো না। তবু এসব অসুস্থ লোকের মানসিক বৈকল্য ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারলাম না।—সে কথা তাঁকে অবশ্যি বলা যায় না। ভাবলাম দু-একদিন পরে এসে তাঁকে জানাবো যে তাঁর পিসতুতো ভাই অনাদি মিত্র ভালোই আছে। পার্কসার্কাসে গিয়ে তাঁর খবর নিয়ে আসার কোনো প্রয়োজন বোধ করলাম না।

তারপরদিন সকাল বেলা খবরের কাগজ খুলে দেখি পার্কসার্কাস অঞ্চলে অনাদি মিত্র নামে এক ভদ্রলোক খুন হয়েছেন। এবং পুলিশ বাড়ির একটি চাকরকে গ্রেপ্তার করেছে।

একজন কেউ খুন হলে আরেকজন কেউ গ্রেপ্তার হবে এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। কিন্তু সেই খুন হওয়ার ঘটনা যে আগের দিন অন্য একজন স্বপ্নে দেখবে সেটাই আমাকে খুব বিস্মিত করলো। কলেজে সেদিন আমার এক সহপাঠীকে সেকথাই বললাম এবং স্বপ্নতত্ব নিয়ে জোর গলার কিছুক্ষণ তর্কও করলাম আমরা।

দিন দুই পর সেই বন্ধুটি এসে আমায় বললে, "আমার পিসে-মশাই তোর সঙ্গে দেখা করতে চান।"

"তোর পিশেমশাই? কেন?" আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

"উনি পাবলিক প্রসিকিউটার, ওই কেসটা ওঁর হাতে পড়েছে। কাল গল্প করতে করতে নিখিল বাবুর স্বপ্নের কথাটা ওঁকে বললাম। তিনি একবার তোর সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।"

তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চাওয়ার কারণ ছিলো। অনাদির মিত্রের খুন হওয়ার ব্যাপারটা ছিলো বেশ একটু রহস্যজনক, পুলিস ঠিকমতো তার কিনারা করতে পারে নি। খবরের কাগজের ভাষায় যাকে অপরাধীর সূত্র বলে ওরকম কিছু পাওয়া যায় নি, অপরাধীর পায়ের ছাপ বা আঙ্গুলের ছাপ, কিছুই নয়। অথচ গলা টিপে মেরে ফেলা হয়েছে অনাদি মিত্রকে, নিখিল ঘোষ যেভাবে বর্ণনা করে দিলেন ঠিক তেমনি। আগের দিন রাত্তিরে সবার সঙ্গে বসে খাওয়া দাওয়া করে তিনি শুতে গেলেন তাঁর ঘরে। সকাল বেলা তাঁকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল বিছানার উপর। ঘর ছিলো ভেতর থেকে বন্ধ। বাড়ির লোককে দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকতে হয়েছিলো। দেখা গেল, ঘরের জানালাগুলিও ভেতর থেকে বন্ধ, এবং বাইরের কোনো লোকের পক্ষে বাড়ির অন্য লোকের চোখ এড়িয়ে তাঁর শোয়ার ঘরে ঢোকা সম্ভব নয়। বাড়ির লোকজনও কাউকে সন্দেহ করার কোনো প্রমাণ নেই। তাদের কারো কোনো প্রয়োজন বা সুযোগও ছিলোনা। পুলিশের লোক ভেবেই পেলোনা কি ভাবে ঘটতে পারে ব্যাপারটা। কেউ যেন অন্তরীক্ষ থেকে পৌরাণিক গল্পের দেবতাদের মতো ঘরের ভিতর আবির্ভূত হয়ে, তাঁকে খুন করে আবার অন্তর্ধান করেছে।

সন্দেহ যেটুকুও বা হোলো সে এক চাকরের উপর। অনাদি মিত্র যখন শুতে যান চাকরটি নাকি তাঁর জন্যে এক গ্লাস জল নিয়ে ঘরে ঢুকেছিলো। কিন্তু বাইরে থেকে সবাই অনাদিবাবুর গলা শুনতে

পেয়েছিলো। লণ্ড্রি থেকে কাপড় নিয়ে আসার ব্যাপারে তিনি কিছু যেন বলেছিলেন তাকে। সে তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে আসে ঠিক দু-এক মিনিট পর। তারপর দু-তিনজন শুনতে পেয়েছিলো ঘরের ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দেওয়ার শব্দ। সেদিন তাঁর কাশি হয়েছিলা খুব। তাঁর কাশির শব্দ শোনা গিয়েছিলো বেশ কিছুক্ষণ। তা-ছাড়া, চাকরটি খুব অল্পবয়েসী বাচ্চা ছেলে, রোগা পটকা। অনাদিবাবু বেশ লম্বা চওড়া, শক্তিমান লোক।

সুতরাং সামান্য সন্দেহর উপর চাকরটিকে গ্রেপ্তার করে চালান দেওয়ার পর পাবলিক প্রসিকিউটার বেশ বুঝতে পারলেন চাকরের বিরুদ্ধে এই মামলা চলবে না।

এমন সময় তাঁর স্ত্রীর ভাইপো আমার সেই বন্ধুটির মুখে নিখিল ঘোষের স্বপ্নের কথা তিনি শুনলেন। এরকম স্বপ্নের উপর ভিত্তি করে নিশ্চয়ই কোনো অপরাধের তদন্ত করা যায় না, তবু তিনি আশা করলেন হয়তো বা এর মধ্যে থেকে কোনো আসল সূত্র যদি পাওয়া যায়। কিন্তু আমার মুখে সব শুনে টুনে তিনি হতাশ হলেন। তিনি যখন আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন তখন পুলিশের কোন এক ইনস্পেক্টার সেনও উপস্থিত ছিলো সেখানে। সে ভদ্রলোকের হাতেই মামলাটার তদন্তের ভার পড়েছিলো। তিনি বললেন, একজন অসুস্থ টাইফয়েডের রোগী স্বপ্নে কি দেখেছিলো তাই নিয়ে মাথা ঘামালে লোকে আমাদের পাগল বলবে।

যাই হোক, করোনারের কোর্টে মামলাটার অবসান হলো।

কিছুদিন পর একদিন ইনস্পেক্টার সেন আমার সঙ্গে দেখা করতে এলো, এলো পুলিসের পোশাক পরে নয়, সাদাসিধে ধুতি পাঞ্জাবি পরে, বললে,—"কান্তি বাবু, আপনার সঙ্গে কি নিখিল ঘোষের খুব অন্তরঙ্গতা আছে?"

আমি বললাম, "খানিকটা আছে। উনি বেশ পছন্দ করেন আমায়, কেন?"

"আমি একটু উৎসুখ হচ্ছি ওঁর সম্বন্ধে," বললো সেন। অবশ্যি অনাদি মিত্রের মারা যাওয়ার সঙ্গে ওঁর কোন সম্পর্ক নেই। তবে আমার মনে হয়, হয়তো অতীতে কোন ঘটনা ঘটে থাকবে যা ছাপ রেখে গেছে নিখিল ঘোষের অবচেতন মনে। তাই নিখিল ঘোষ স্বপ্ন দেখেছিলো। আমি এক সাইকায়াট্রিস্টকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। সে বললে, শুধু ওই একটি স্বপ্নের উপর ভিত্তি করে কোনো অনুমান করা যায় না। কিছু জানতে হলে নিখিল ঘোষকে আরো অনেক কিছু জিজ্ঞেস করতে হবে। আমি তাতে রাজী হলাম না। যাই হোক, নিখিল ঘোষের মুখে আর কিছু শুনলে যদি আমায় জানান তো ভালো হয়। মানে, ওই স্বপ্নটপ্নের ব্যাপার, আর কিছু নয়।"

মাস তিনচার কেটে গেল।

একদিন চৌরঙ্গির এক রেস্তরাঁয় নিখিল ঘোষের সঙ্গে হঠাৎ দেখা। একা বসেছিলেন তিনি। আমায় দেখেই ডাকলেন। কি জানি কেন, হঠাৎ আমার মনে একটা অরুচির ভাব এলো। যেতে ইচ্ছে করলো না। তবু ভদ্রতা রক্ষা করবার জন্যে তাঁর টেবিলে গিয়ে বসলাম। দেখলাম, তাঁর গাল দুটো ভেঙ্গে গেছে, কালো দাগ হয়ে গেছে, চোখের চারদিকে।

বললাম, "মনে হচ্ছে ইদানীং আপনার প্রচুর খাটুনি পড়েছে।"

তিনি উত্তর দিলেন, "খাটুনি? না, তা নয়। দুর্ভাবনা। প্রচুর দুর্ভাবনা।"

ভাবলাম জিজ্ঞেস করি কিসের এত দুর্ভাবনা, কিন্তু চুপ করে রইলাম।

কি যেন ভাবছিলেন নিখিল ঘোষ। তারপর হঠাৎ বললেন, "জানো, কাল রাত্তিরে একটা খুব খারাপ স্বপ্ন দেখেছি। আমার খুব মন খারাপ হয়েছিল।"

শুনলাম নিখিল ঘোষের স্বপ্ন। স্বপ্নে দেখেছেন, তিনি বেড়াতে গেছেন স্কটল্যাণ্ডে। ঘুরতে ঘুরতে এক নির্জন নদীর পাড়ে এসে দেখলেন একটি নৌকো বাঁধা রয়েছে। তিনি একটি পেরেক ও হাতুড়ি দিয়ে নৌকোর তলা ফুটো করে দিলেন। তারপর লুকিয়ে পড়লেন একটি বড়ো পাথরের চাঁইয়ের আড়ালে। একটু পরে একটি লোক নৌকোর দড়ি খুলে তাতে উঠে পড়ে নৌকো ছেড়ে দিলো। মাঝ নদীতে গিয়ে নৌকোয় জল উঠে নৌকো ডুবে গেল। বেচারা সাঁতার জানতো না।

বাড়ি ফিরে যেতে নিখিল ঘোষের স্বপ্নের কথা আর মনে রইলো না। মনে পড়লো তিনদিন পর। ইনস্পেক্টার সেন থাকতো আমার এক দিদিব বাড়ির কাছেই। তাকে জানালাম ব্যাপারটা।

শুনে সে একটু চুপ করে রইলো, তারপর বললো "কান্তিবাবু, শুনলে অবাক্ হবেন, দিন ছয়েক আগে স্কটল্যাণ্ডে একটি বাঙালী ছেলে ঠিক ওই ভাবে নৌকো ডুবি হয়ে মারা গেছে।"

আমি শুনে অবাক হয়ে বলে উঠলাম, "আপনি নিশ্চয়ই বলতে চান না এ ব্যাপারে নিখিল ঘোষের কোনো হাত আছে।"

"নিশ্চয়ই না," উত্তর দিলো ইনস্পেক্টার সেন, "ঘটনাটা ঘটেছে স্কটল্যাণ্ডে। নিখিল ঘোষ আছে কলকাতায়। তবে আশ্চর্য ব্যাপার, ওই দুর্ঘটনায় সেই বাঙালী ছেলেটি মারা গেছে, সে অনাদি মিত্রের ছোট ভাই অরুণ মিত্র।"

কিছুদিন পর সুনীল নিখিল ঘোষকে গ্রেপ্তার করলো। না, কোনো রকম খুনের অভিযোগে নয়। তিনি যে ব্যাঙ্কের ডিরেক্টার, সেই ব্যাঙ্কের আমানতের টাকা নিয়ে কি সব যেন গোলমাল হয়েছে।

পুলিশের সন্দেহ হয়েছে যে বহু টাকা নিখিল ঘোষও হাতড়িয়েছে। কাগজে ফলাও করে খবরটা বেরোলো। চারিদিকে খুব কথা হোলো এ নিয়ে, কারণ ব্যাঙ্কের সুনাম ছিলো, নিখিল ঘোষেরও সুনাম ছিলো। যাই হোক, তিনি জামিন পেলেন না চটকরে, কয়েকদিন হাজতে থাকতে হোলো।

তারই মধ্যে একদিন ইনস্পেক্টার সেন আমায় এসে বললো, "নিখিল ঘোষের সঙ্গে একবার হাজতে দেখা করুন।"

আমি আপত্তি জানালাম। কিন্তু সেন ছাড়লো না। বললো, "যা বলছি একবার করুন না। বিশেষ দরকার।"

"কি দরকার ?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"সে পরে বলবো," সেন উত্তর দিলো।

"দেখা করে কি করবো", আমি জানতে চাইলাম।

"এই, এমনি দেখা করবেন। কিছু অসুবিধে হচ্ছে কিনা জানতে চাইবেন। বলবেন, আমার সঙ্গে আপনার চেনা আছে। যদি দরকার হয়তো আমাকে বলে দেখবেন কিছু সুবিধে হয় কিনা। ওর ভাই অনিল তো প্রত্যেকদিন দেখা করতে যায়। ওর সঙ্গেই একদিন চলে যান।"

অনিলের সঙ্গে গিয়ে একদিন নিখিল বাবুর সঙ্গে হাজতে দেখা করে এলাম। পরে ইন্সপেক্টার সেনের সঙ্গে যখন দেখা হলো. সে একবার চোখ তুলে আমার দিকে তাকালো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, "বলুন, নিখিল ঘোষ এবার হাজতে বাস করতে করতে নতুন কি স্বপ্ন দেখেছেন।"

আমি চট করে কিছু বলতে পারলাম না। আমার শিরদাঁড়া বেয়ে বেয়ে একটা বিদ্যুতের শিহরণ বয়ে গেল।

"থাক, থাক। আর বলতে হবে না," বললো সেন, "আপনার মুখ দেখেই বুঝে নিয়েছি। আপনাকে ওর সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলাম শুধু আমার একটি সন্দেহ যাচাই করে নিতে।"

ঘটনাটা শুনলাম। এবার নিহত হয়েছে একটি মহিলা। তেতলার ছাদের উপর। পাঁচিলের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। কে যেন ঠেলে ফেলে দিয়েছে। মহিলাটি নিখিল ঘোষের খুড়তুতো বোন।

হাজতে নিখিল ঘোষের কাছে শুনেছিলাম মহিলাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিলেন তিনি নিজেই।

ইন্সপেক্টার সেন বললো, "আশ্চর্য ব্যাপার। এ কাউকে বলতেও পারছিনা। বললে নিখিল ঘোষকে না হোক আমাকে তো পাগলাগারদে পাঠাবেই। অথচ কি করবো ভেবে পাচ্ছিনা।

কয়েকদিন পর নিখিল ঘোষ হাইকোর্টে আবেদন করে জামিনে খালাস পেলেন।

আরো একমাস কেটে গেল। তারপর একদিন শুনলাম সিঁড়িতে পা পিছলে পড়ে নিখিল ঘোষ সাংঘাতিক আহত হয়েছেন। পায়ের হাড় ভেঙ্গে পড়ে আছেন এক নার্সিং হোমে।

সেদিন ইনস্পেক্টার সেন আমার সঙ্গে দেখা করতে এলো। কয়েকটি পারিবারিক দুর্ঘটনায় ওর ভাই অনিল অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছে। ওকে কিছুদিন সঙ্গে রাখা কি সম্ভব? আমার সঙ্গে গেলে হয়তো ওর মনটা ভালো থাকবে।

আমার কোনো অসুবিধে ছিলো না। বাড়ির সবাই তখন দার্জিলিঙে। অনিলকে একটা ঘর ছেড়ে দিলাম।

সেদিন রাত্তিরে অনিল তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়লো। আমি বাইরের ঘরে এসে একটি গল্পের বই পড়ছি, এমন সময় ইনস্পেক্টর সেন আবার এলো। সঙ্গে একটি এ্যালসেশিয়ান কুকুর। "বললেন, কাছেই এক বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে এসেছিলাম। ফেরার পথে ভাবলাম দেখে যাই আপনারা কি করছেন।"

একটু পরে বললেন, "নিখিল বাবুর কেসটা অদ্ভুত। আমাদের ধারণা নিখিল ঘোষ ব্যাঙ্কের অনেক টাকা সরিয়েছে। এখন আবার

নিজের মান বাঁচাতে একটা মোটা টাকার যোগাড় করা দরকার। আমরা আরো জেনেছি যে নিখিল ঘোষের এক কাকা প্রচুর সম্পত্তি রেখে গেছেন ভাইপো-ভাগ্নেদের জন্যে। এই যৌথ সম্পত্তির মালিক ছিলো অনাদি মিত্র, অরুণ মিত্র, নিখিল বাবুর সেই খুড়তুতো বোন যিনি মারা গেছেন, নিখিল বাবুর ভাই অনিল আর নিখিলবাবু নিজে। প্রথম তিনজন আর নেই, অনিলও যদি না থাকতো তাহলে সবটা নিখিলবাবুর একলার হোতো।"

আমি হাসতে হাসতে বললাম, "আপনি নিশ্চয়ই বলতে চাইছেন না যে ওই তিনজনকে নিখিলবাবুই সরিয়েছেন?"

"না, সে কথা কি করে বলবো," উত্তর দিলো ইন্সপেক্টার সেন। "অনাদি মিত্র যখন মারা গেল, নিখিলবাবুর তখন টাইফয়েড। অরুণ মিত্র যখন স্কটল্যাণ্ডে মারা গেল, নিখিলবাবু তখন কলকাতায়। ওঁর খুড়তুতো বোন যখন মারা গেলেন, উনি তখন হাজতে। সুতরাং তিনি তাদের দুর্ঘটনা স্বপ্নে দেখেছেন বলে, সেই স্বপ্নে নিজে তাতে জড়িত ছিলেন বলে, এবং সেই স্বপ্ন সত্যি হয়েছে বলে তো আর তাঁকে এসব দুর্ঘটনার জন্যে সত্যি সত্যি দায়ী করা যায় না।—তবে আমি ভাবছি অন্য কথা।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কি ভাবছেন?"

সেন উত্তর দিলো, "প্রত্যেকবার যখন একটা না একটা দুর্ঘটনা ঘটে, দেখা যায় যে নিখিল ঘোষ কোনো না কোনো রকম ভাবে অক্ষম হয়ে পড়ে আছে। হয়তো তার টাইফয়েড, নয় তো সে ঘটনাস্থল থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে, নয়তো বা হাজতে বন্ধ। এবার দেখছি সে পা ভেঙে জখম হয়ে নার্সিং হোমে পড়ে আছে। আমার মনে হচ্ছে, হয়তো সে এবার আরেকটি স্বপ্ন দেখবে।"

"মানে?" আমি অবাক হয়ে বললাম।

"মানে, আমি দু-একদিন রাত্তিরে এখানে থাকবো।" সেন উত্তর দিলো।

সেনের কথা শুনে আমার হাসি পেলো। তবে এ নিয়ে আর কিছু বলা প্রয়োজন মনে করলাম না।

কিন্তু আমার বাড়িতে ইন্সপেক্টার সেনের রাত্রিবাস করার প্রয়োজন হোলো না।

অনিল ঘোষ ঘুমিয়ে ছিলো পাশের ঘরেই। দরজাটা ভেজানো ছিলো। আমি আর ইন্সপেক্টার সেন যখন কথা বলছি, হঠাৎ যেন মনে হোলো ওঘরের জানালাটা বেশ শব্দ করে খুলে গেল আর কেউ যেন লাফিয়ে পড়লো ঘরের ভিতর।

আমি আর সেন সে শব্দ শুনে ফিরে তাকালাম। কাছেই চুপচাপ বসেছিলো তার কুকুর। সে কিন্তু অপেক্ষা করলো না। হঠাৎ উঠে ছুটে গেল ঘরের ভিতর। আমরাও গেলাম পেছন পেছন। অন্ধকার ঘরে সেই কুকুর গর্জে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়লো কোনো একটা কিছুর উপর। একটি কালো ছায়া যেন ধপ করে মেঝের উপর লুটিয়ে পড়লো। আমি সুইচ টিপে আলো জ্বাললাম।

দেখলাম, অনিল ঘুম ভেঙে উঠে পড়েছে। কিন্তু কে কামড়ে ধরে চেপে আছে সেনের এ্যালসেশিয়ান কুকুর? ভালো করে চোখ রগড়ে দেখলাম।—কিছু না। শ্রেফ কিচ্ছু না। কুকুরটিও গজরাতে লাগলো, সেও যেন অবাক হয়ে গেছে খুব।

ইন্সপেক্টার সেন কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর কুকুরটিকে নিয়ে আসতে আসতে চলে গেল।

নিখিল ঘোষের খবর পেলাম তার পরদিন সকাল বেলা। রাত্তিরে ঘুমের মধ্যেই তিনি মারা গেছেন। একটা বীভৎস চিৎকার শুনে ডাক্তার নার্স সবাই ছুটে কেবিনে গিয়ে দেখে তিনি গলাটা চেপে ধরে

বিছানার উপর ছটফট করছেন। তারপর দু-মিনিটের মধ্যেই সব শেষ।

* * * *

কান্তি রায়চৌধুরীর গল্প বলা শেষ হোলো।

অন্য সবাই চুপচাপ শুনলো। তারপর অনিচ্ছা সত্ত্বেও সবার চোখ পড়লো বিভূতি দত্তের উপর। দেখলো বিভূতি দত্তের কান দুটো লাল হয়ে গেছে।

শুধু মনোবিজ্ঞানের রিসার্চ-স্কলার অসিত চ্যাটার্জী মনে মনে খুব হাসলো।

বনানী খুব কুকুর ভালোবাসতো। বিভূতি দত্ত তাকে একদিন একটি এ্যালসেশিয়ানের বাচ্চা উপহার দিলো। দুতিন রোববারের মধ্যেই সেই কুকুর ছানা রোববারের আসরে সবারই বন্ধু হয়ে গেল।

সেদিন ছিলো প্রফেসার সিদ্ধার্থ বোসের গল্প বলার পালা। গল্প সুরু করবার আগে সে বনানীর কুকুর ছানাকে আদর করছিলো।

মঞ্জু লাহিড়ি হঠাৎ বলে উঠলো, "মানুষ ভূতের গল্প অনেক শুনেছি। এবার একটা নূতন কিছু শোনা যাক।"

"নতুন কিছু?" জিজ্ঞেস করলো সিদ্ধার্থ বোস, "মানে, কোনো নতুন ধরণের অলৌকিক কিছু?"

"তা তো বটেই। আমাদের রোববারের আসর তো ও সব গল্পের জন্যেই, যা সত্যি হতে পারে না, যা অসম্ভব, অবাস্তর। তবে যাই বলুন আর মানুষ ভূতের গল্প নয়।"

"ভূতেরা কি মানুষ?" জিজ্ঞেস করলো পরিমল সেনগুপ্ত।

"মাঝে মাঝে ওরা তো রীতিমত অমানুষ," বললো বিভূতি দত্ত।

"আমি বলছিলাম যে সব ভূত মানুষ থেকে ভূত হয় ওদের কথা," বলে মঞ্জু লাহিড়ি রসগোল্লার ডিশটা অন্য দিকে চালান করে দিলো। "ওদের কথা শুনে শুনে আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি। এবার অন্য কোনো একটা ভূতের গল্প শোনা যাক যে অন্য কোনো প্রাণী থেকে ভূত হয়েছে, মানুষ থেকে নয়। ওরকম কোনো ভূতের কথা কি আপনারা কেউ শোনেন নি?"

"আমি শুনেছি," উত্তর দিলো সিদ্ধার্থ বোস, "আর সে গল্পই আমি আপনাদের বলতে যাচ্ছিলাম, আপনি বলবার আগেই।"

"ও তাই বুঝি!" ভুরু উত্তোলন করে মীনা সেন বলে উঠলো, "এ আবার কী ধরণের ভূত?"

"কুকুর ভূত," সিদ্ধার্থ বোস গম্ভীরভাবে উত্তর দিলো। সবাই হেসে ফেললো ওর কথা শুনে। মঞ্জু লাহিড়ি জিজ্ঞেস করলো, "মানে, যে ভূত কুকুর ছিলো ভূত হওয়ার আগে?"

"ঠিক তাই।"

"তা'হলে তো শোনবার মতো নিশ্চয়ই," মীনা সেন বললো, "আমি কুকুর খুব ভালোবাসি। আপনাকে কি আরেক কাপ চা করে দেবো?"

"আমি যে কুকুর ভূতের গল্প আজ বলছি,"—সিদ্ধার্থ বোস সুরু করলো—"সে ছিলো একটি এ্যালসেশিয়ান কুকুর।

আমার এক বন্ধু ছিলো। তার নাম সোমনাথ ঘোষ। হয়তো বা তার নাম সবাই শুনে থাকবেন এককালে খুব ক্রিকেট খেলতো সে। এখন ক্রিকেট আর খেলে না, অনেকেই তাকে ভুলে গেছে। একটি ভালো চাকরি করে এক বিলাতী ফার্মে, বিয়ে থা করেনি। পার্ক সার্কাস ময়দানের কাছে একলা একটি ফ্লাট নিয়ে থাকে।

এ্যালসেশিয়ানটিকে সে পেয়েছিলো এক বুড়ো ইহুদীর কাছে। তাকে সে একেবারে বাচ্চা বয়েস থেকে নিজের কাছে রেখে বড় করেছিলো। খুব সুন্দর ছিলো কুকুরটি, ডগ্-শো-তে প্রাইজ পাওয়ার মতো কুকুর। অন্য সব এ্যালসেশিয়ানের মতোই সে ছিলো অত্যন্ত প্রভুভক্ত এবং, একনিষ্ঠ, খুব বিশ্বাসী, সাহসী, আর খুব চালাক। এমন কি, তার কিছু কিছু শার্লক হোমসের মতো গুণও ছিলো। ওযে শুধু চোর তাড়াতো তা নয়, ধারে কাছে কোথাও চুরি হলে বেশ মাটি শুঁকে শুঁকে গিয়ে চোর ধরে আনতে পারতো। অত্যন্ত একগুঁয়ে ছিলো এ ব্যাপারে। যতক্ষণ চোর ধরা না পড়ছে, ততক্ষণ তাকে কিছুতে বাড়ি ফিরিয়ে আনা যেতো না। তাকে নিয়ে সোমনাথের খুব গর্ব।

একদিন সন্ধ্যায় এই কুকুর—আর নাম জনি—বীরের মতো মৃত্যু-বরণ করলো। সে এমন একটা গৌরবময় আত্মদান যার জন্যে যে কোনো প্রভুভক্ত-কুকুরই ঈর্ষান্বিত হবে। একেবারে সম্মুখসংগ্রামে প্রাণবিসর্জন দিলো সে। সোমনাথ তাকে নিয়ে একদিন ময়দানে বেড়াতে গিয়েছিলো। তখন সন্ধ্যা হয়ে চারিদিক বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। জনি এদিক ওদিক ছোটাছুটি করতে করতে এক সময় সোমনাথের কাছে-ছাড়া হয়ে হারিয়ে গেল ময়দানের অন্ধকারে। সোমনাথ চারিদিকে খোঁজাখুঁজি করলো, শীষ দিলো, ডাকলো তার নাম ধরে। চারদিক আরো বেশ অন্ধকার হয়ে গেল। আরো বেশী নির্জন হয়ে এলো অন্ধকার ময়দান। হঠাৎ দুজন লোক সোমনাথের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো। তাদের একজনের হাতে একটি পিস্তল। সে সোম-নাথের মানিব্যাগ, ঘড়ি, পেন সব তুলে নিলে একটা একটা করে। সোমনাথ একলা নিরুপায় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। হঠাৎ সেই কুয়াশাঘন অন্ধকারের অন্তরাল থেকে জনির বিশাল দেহটি তীরের মতো ছুটি বেরিয়ে এসে যে গুণ্ডার হাতে পিস্তল ছিলো তার পিঠের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। সে লোকটি মাটিতে গড়িয়ে পড়লো। সেই কুয়াশা

আর উত্তেজনায় ঘটনাগুলো এত দ্রুত ঘটে গেল যে সোমনাথ এখনো পরিষ্কার মনে করতে পারে না,—একটা তীব্র চিৎকার, পিস্তলের পর পিস্তলের কয়েকটা গুলি, একটি কুকুরের কাতর আর্তনাদ, পুলিস ভ্যানের দ্রুত আবির্ভাব, চারিদিকে একটা জনতা, হৈচৈ হট্টগোল, শুধু এরকম কয়েকটি টুকরো টুকরো ছবি মনে আছে সোমনাথের। যাই হোক গুণ্ডা দুজন পুলিশের হাতে ধরা পড়লো। বিশ্বস্ত এ্যালসেশিয়ান জনি তার প্রভুকে বাঁচালো নিজের প্রাণ দিয়ে।

খবরটা কাগজে বেরোলো। সোমনাথ আর ওর কুকুরের ছবিও বেরোলো সেই সঙ্গে। অনেক সহানুভূতির চিঠি এলো সেই সঙ্গে, অনেকে তাকে নতুন এ্যালসেশিয়ান, রিট্রীভার, ব্লাডহাউণ্ড দিতে চাইলো নিজের থেকে সেধে। শোনা গেল কারা যেন চাঁদাও তুলতে সুরু করেছে আসন্ন ডগ্-শো'তে জনির নামে একটি ট্রফি দেবে বলে।

যাই হোক, সাত আট দিনের মধ্যে সোমনাথের বাড়িতে আরেকটি বিশ্বস্ত এ্যালসেশিয়ান কুকুর এলো। সেও প্রায় জনির মতোই সুন্দর। তবে অতো বুদ্ধিমান নয়।

সোমনাথ যখন তাকে বাড়ি নিয়ে এলো, সে চারদিক শুঁকলো, ঘরগুলো টহল মেরে পর্যবেক্ষণ করলো। মনে হোলো যেন বেশ পছন্দ করেছে তার নতুন প্রভুর বাড়ির পরিবেশ। একদিনের মধ্যেই সে নিজেকে বেশ খাপ খাইয়ে নিলো তার নতুন পরিবেশের সঙ্গে। আশে-পাশের বাড়ির অন্যান্য কুকুরদের ধমকে ঘেউ ঘেউ করলো, বাড়ির কয়েকটি বেড়াল, যাদের জনি কিছু বলতো না এবং অবাধে বিচরণ করতে দিলো, তাদের তাড়ালো বাড়ি থেকে। সোমনাথের মনে হোলো এও নিশ্চয় খুব সাহসী কুকুর। সে খুব নিশ্চিন্ত এবং নিরাপদ বোধ করলো কারণ বাড়িতে সে শুধু একা। এবং সে সময় চারদিকে খুব চুরির হিড়িক পড়েছে।

কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসবার পর এই নতুন কুকুরের মুখের ভাব একেবারে বদলে গেল।

কিছুক্ষণ সে নাক উঁচু করে শুঁকলো। তারপর নিজের চোখের দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করলো ঘরের এক কোণের অন্ধকারের দিকে, যেন সেখানে কিছু দেখতে পেয়েছে। সোমনাথ ভাবলো, কী ব্যাপার। সে এগিয়ে গিয়ে দেখলো, না, কিছুই নয়, শুধু একটুখানি ঘরের কোণের অন্ধকার। সে ফিরে দাঁড়াতে দেখলো তার নতুন এ্যালসেশিয়ান কুকুর পিছু হটে হটে ঘরের অন্য কোণে গিয়ে কুঁকড়ে দাঁড়িয়েছে। তার বাহারে ল্যাজটি খুব অসম্মানজনকভাবে পেছনের পা দুটোর মাঝখান দিয়ে ভেতরে সেঁধিয়ে দেওয়া, তার চোখে এমন একটা ভয়ের দৃষ্টি সে দেখলো অন্য এ্যালসেশিয়ানেরা তাকে এ্যালসেশিয়ান সমাজ থেকে বার করে দিতো।

সোমনাথ ভাবলো, হয়তো কুকুরটার শরীর খারাপ হয়েছে। স্থির করলো, পরদিন তাকে কোনো পশু চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাবে। সে তাকে পাঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলো শোয়ার ঘরের বাইরের ছাতে যেখানে এককালে জনিই টহল দিতো সারারাত। কিন্তু নতুন কুকুর নড়তে চাইলো না ঘরের ভিতর থেকে। সোমনাথ তার কলার ধরে তাকে ঘরের বাইরে নিয়ে এলো। কিন্তু সেখানে এনে তাকে ছেড়ে দিতেই কুকুরটি তিন লাফে ঘরের ভিতর ফিরে এলো।

সেদিন রাত্তিরে সোমনাথের ভালো ঘুম হোলো না। থেকে থেকে সে শুনতে পেলো বাইরের ছাতের তার নতুন এ্যালসেশিয়ান কুকুরটি খুব মিহি গলায় কঁকিয়ে ডাকছে, যেমনি করে ডাকে রাস্তার দিশী কুকুরগুলো। মাঝে মাঝে মনে হোলো যেন আরেকটি গুরুগম্ভীর চাপা ঘর্ঘর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, যে ধরণের আওয়াজ ছেড়ে অভিজাত শক্তিমান কুকুরেরা শাসায়, ভয় দেখায় দুর্বল অকুলীন কুকুরদের। ঘুমের ঘোরে সোমনাথের মাঝে মাঝে মনে হোলো সে আওয়াজ যেন

খুব চেনা, জনির আওয়াজের মতো। যাই হোক সে বেশী ভাবলো এ নিয়ে। চেষ্টা করলো ঘুমিয়ে পড়বার।

পর পর তিন দিন এরকম হতে সোমনাথ গিয়ে কুকুরটিকে তার প্রাক্তন মনিবকে ফিরিয়ে দিয়ে এলো। তার সঙ্গে একটা সখ্যতা ছিলো। কিন্তু এই এ্যালসেশিয়ানকে ভীতু বলাতে সেই সদ্ভাব নষ্ট হোলো।

যাই হোক সোমনাথ কুকুব ছাড়া থাকতে পারতো না। এবার সে একটি গ্রে-হাউণ্ড নিয়ে এলো। পাঁচ রাত্তির সেই করুণ আর্তনাদ ও ঘর্ঘর গর্জনের পুনরাবৃত্তি। সোমনাথ এই কুকুরকেও ফিরিয়ে দিলো। আরো একটি সদ্ভাব নষ্ট হোলো।

এর পর সোমনাথ নিয়ে এল একটি রিট্রিভার। সেও এমন কিছু সাহস দেখাতে পারলো না। এমনিভাবে দু-তিন রাত কেটে যাওয়ার পর সোমনাথ স্থির করলো এই সারমেয়-সঙ্গীতের রহস্যটা একবার অনুসন্ধান করে দেখতে হবে।

তখন রাত দুটো। জানলার ওপারে একফালি চাঁদ নিবিড় কালো পিপুলের ওপার থেকে উঁকি দিচ্ছিলো। ডিসেম্বরের শীত-নিথর রাত্রি ছড়িয়ে পড়েছিলো ঘুমন্ত পথের এ মোড় থেকে অন্য মোড় পর্যন্ত। বিছানায় একলা জেগে ছিলো সোমনাথ।

বাইরের বারান্দায় কুকুরটি হঠাৎ কঁকিয়ে উঠলো। মনে হোলো যেন বেজে উঠলো একটি তীক্ষ্ণ এয়ার রেড সাইরেনের মতো। সঙ্গে সঙ্গেই আরেকটি খানদানী কুকুরের গুরুগম্ভীর গর্জন শোনা গেল।

সোমনাথ তার বিছানার উপর উঠে বসলো। মনে হোলো যেন অন্য কুকুরটা জনি। তাই বা কি করে হবে, কী সব আবোল-তাবোল ভাবছে সে।

পরমুহূর্তেই সে বেরিয়ে এলো সামনের ছাতে। দেখলো, তার নতুন রিট্রিভার এক কোণে জড়োসড়ো হয়ে কুঁকড়ে আছে। সোমনাথ

ঘুরে দাঁড়ালো। একটা বরফের স্রোত বয়ে গেল তার শিরদাঁড়া বেয়ে। নিজের চোখ দুটো বিশ্বাস করতে পারলো না সে। দেখলো একটি মস্তো বড়ো এ্যালসেশিয়ান দূরে এক কোণে দাঁড়িয়ে ল্যাজ নাড়ছে তাকে দেখে। মনে হোলো যেন, জনি ওখানে এসে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু, না, সে জনি নয়, হতে পারে না,—সোমনাথ ভাবলো—এ শুধু চোখের ভুল। ঠিক তা নয়, ও আরেকটি এ্যালসেশিয়ান, এবং এবং সব এ্যালসেশিয়ানই প্রায় একই রকম দেখতো। কিন্তু এই কুকুরটাই বা এলো কোত্থেকে? এখানে ঢুকলোই বা কি করে? রাতের এই সময়ে নিজের বাড়িতে এক অচেনা এ্যালসেশিয়ান এসে নিজের কুকুরকে ভয় দেখাতে দেখলে কেউই খুশী হয় না, সোমনাথও হোলো না।

কিন্তু এই এ্যালসেশিয়ান তাকে দেখে ল্যাজ নাড়ছিলো। অন্যের এ্যালসেশিয়ান অচেনা বাড়িতে এসে অচেনা লোককে দেখে ল্যাজ নাড়ে না। তাহলে?

কুকুরটির দিকে এগিয়ে গেল সোমনাথ। আর চোখের পলক ফেলবার আগেই কুকুরটি অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। সোমনাথ চারদিকে খোঁজাখুঁজি করলো। কোথাও একটি ইঁদুর দেখতে পেলো না—শুধু এক কোণে তার রিট্রিভার কুকুটাই কঁকিয়ে কঁকিয়ে ডাকছিলো।

সোমনাথ শোয়ার ঘরে ফিরে এলো। যখন দরজা বন্ধ করছে, আবার দেখলো কুকুরটাকে। সে চুপচাপ বসে আছে দূরের অন্ধকারে। পরমুহূর্তে আবার মিলিয়ে গেল।

সোমনাথ ভাবলো সে নিশ্চয়ই ভুল দেখেছে। আকাশে যখন একটি ক্ষীণ চাঁদ টিমটিম করে, আর টুকরো টুকরো ছায়ায় ছমছম করে চারদিকে, তখন চোখের ভুল হয়, মনে হয় যেন এখানে এটা দেখছি, ওখানে ওটা দেখছি।

তারপর দিন সকালে ঘুম ভাঙতে আরো বিস্মিত হওয়ার কারণ

ঘটলো। বিছানার পাশ থেকে কে যেন চটি-জোড়া ঘরের কোণে টেনে নিয়ে গেছে। কৌচের উপর পড়ে আছে একটি রবারের বল, যেটি নিয়ে জনি খেলতো এক সময় এবং ইদানীং পড়েছিলো তার খাটের নিচে। মনে পড়লো, জনিও এরকম দুষ্টুমি করতো। কিন্তু বলটা খাটের নিচে থেকে কৌচের উপর গিয়ে উঠলো কি করে? বলের নিশ্চয়ই পাখা গজায় নি। চটি-জোড়াই বা ঘরের কোণে কে টেনে নিয়ে গেল? সোমনাথ তড়াক করে খাটের উপর উঠে বসলো। চোখ কপালে তুলে দেখলো ঘরের মেঝেতে চারদিকে কুকুরের পায়ের ছাপ।

সোমনাথ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হোলো যেন সেগুলো হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। নিশ্চয়ই মনের ভুল, ভাবলো সোমনাথ।—কিন্তু সেই একই অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি হোলো তারপর দিন, তার পরদিনও। সোমনাথ ভাবতে সুরু করলো এরকম সব মনের ভুল তার হচ্ছে কেন? মনের রোগ হচ্ছে না তো? একবার ভাবলো, কোনো নিউরালজিস্টকে দেখাই। তারপর ভাবলো, নাঃ, অতো বাড়াবাড়ি করবার দরকার নেই। বাড়ি পাল্টালেই হবে। এ বাড়িব ভূত এ বাড়িতেই থাক।

বাড়ি পাল্টালো সে। সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করলো যে তার সেই কুকুরের ছায়াও এই নতুন বাড়িতে এসে ডেরা বেঁধেছে। যেন, তাকে আর এড়ানোর উপায় নেই! জনি ছিলো তার খুব আদরের কুকুর।

সে অবশ্যি সোমনাথের কোনো ক্ষতি করলো না, কোনোরকম ভয় পাওয়ারও কোনো কারণ ঘটলো না। বরং কিছু উপকারই হোলো। ঘরের ভিতর দুধের বাটি খোলা পড়ে থাকলেও কোনো বেড়াল ঘরে ঢুকতো না। একদিন সোমনাথ ভুল করে দরজা খোলা রেখে বেরিয়ে গিয়েছিলো। ফিরে আসতে পড়শীদের কাছে শুনলো

যে ঘরে চোর ঢোকবার চেষ্টা করেছিলো কিন্তু তারপর একটা কুকুরের গর্জন শোনা গেল এবং সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল একটি চোর পরিত্রাহি চিৎকার করতে করতে ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে পথ ধরে ছুটছে। তার চিৎকার যে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে সে খেয়াল নেই। ধরা পড়তে সে বললে যে ঘরের ভেতর একটা সাংঘাতিক অতিকায় কুকুর আছে। কিন্তু পড়শীরা যখন কোনো কুকুরের চিহ্নও পেলো না, খুব অবাক হোলো সবাই।

সোমনাথ মনে মনে কৃতজ্ঞ বোধ করলেও, ভয়ও পেলো। সে আবার বাড়ি বদলালো। কুকুরটিও আবার এলো সঙ্গে সঙ্গে। সে বাড়ি ছেড়ে আরেকটি বাড়িতে গেল! সেখানেও দেখা গেল কুকুরটাকে।

তখন নিরুপায় হয়ে তার এক বিশ্বস্ত বন্ধুকে গিয়ে বললো। তার নাম প্রণব। তার অনেকদিনের বন্ধু। সে সব শুনেটুনে বললো, "আচ্ছা, আমি একটা ব্যবস্থা করছি!"

কিছুদিন পরে সে এসে বললো, "আমি তোমার জন্য নতুন বাড়ি ঠিক করেছি। তুমি এ বাড়ি ছেড়ে দিয়ে সেখানে উঠে যাও।"

সোমনাথ আবার বাড়ি বদলালো বন্ধুর কথামতো। তার বিশ্বস্ত কুকুরটি এড়ানোর জন্যে তাকে যা বলা হয়, তাই করতে রাজী।

তার নতুন বাড়িটি টালিগঞ্জের শেষ প্রান্তে একটু নির্জনে একটি ভারী সুন্দর একতলা বাংলোবাড়ি। একজনের পক্ষে বেশ বড়ো। দেখে সোমনাথ খুসী হোলো কারণ সে তখন বিয়ে করবার উদ্যোগ করছে। আর ভাড়া হিসেবও অত্যন্ত সস্তা।

দিনের বেলা বেশ কাটলো। কিন্তু সন্ধ্যে হতে না হতেই ওর গা ছমছম করতে লাগলো। কিন্তু এটা তার অকারণ স্নায়বিক বিকলতা ভেবে সে জোর করে ভয় ভাবনা মুছে ফেললো মন

থেকে। চারদিকের আবহাওয়া বেশ স্নিগ্ধ, পরিবেশ বেশ শান্তিময়। বেশ খুশি-খুশি মনে খাওয়াদাওয়া শেষ করে সে শুতে গেল।

যখন সে জাগলো তখন রাত বোধহয় দুটো। দেখলো রাত্রি বেশ ঠাণ্ডা হওয়া সত্ত্বেও সে ঘেমে নেয়ে উঠেছে। মনে একটা চাপা অসোয়াস্তি। বাইরে থমথমে অন্ধকার। রাত্রি এত স্তব্ধ যে বাইরের গাছে নিদ্রাতুর পাখির সামান্য ডানার শব্দও পরিষ্কার শুনতে পাওয়া যায়। সেই স্তব্ধতার মধ্যে একটা ক্ষীণ আওয়াজ ভেসে এলো। কে যেন হেঁটে আসছে বাড়ির দিকে। কান পেতে শুনলো সোমনাথ। সেই শব্দ আস্তে আস্তে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। কে যেন বারান্দায় উঠে এসে ঘরের ভেজানো দরজাটা ঠেলে খুলছে চুপচাপ।

ভূত নিশ্চয়ই নয়, সোমনাথ ভাবলো। ভূতেরা দরজা ঠেলে ঘরে ঢোকে না, পাতলা হাওয়া থেকে নয়নের সামনে আবির্ভূত হয়। নিশ্চয়ই চোর। সোমনাথ বেড-সুইচটা টিপলো। কিন্তু আলো জ্বললো না। কেউ নিশ্চয় মেন-সুইচ বন্ধ করে দিয়েছে।

দরজা খুলে গেল। দরজার আয়তক্ষেত্রে দেখা গেল একটি দীর্ঘ দেহের ছায়ারেখা, বাইরের রাত্রির পটভূমিকায়, যেই রাত্রি এ লোকটির ছায়া থেকে শুধু এক পোঁচ কম কালো।—সোমনাথ কি করবে ভেবে স্থির করবার আগেই একটা ভয়ানক কুকুরের ডাক শোনা গেল। ঘরের ভিতরের অন্ধকার থেকে রূপ গ্রহণ করলো এক অতিকায় এ্যালসেশিয়ান কুকুরের ছায়া। সে ঝাঁপিয়ে পড়লো অন্য লোকটির ছায়ার উপর। কিন্তু লোকটি খুব ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ঘুরে গিয়ে একটা অবিশ্বাস্য গতিতে ছুটে চলে গেল। তার পেছন পেছন সেই অতিকায় কুকুরের ছায়া।

রাত কেটে গেল। সোমনাথের চোখে ঘুম নেই। সকাল হোল; সে তার বন্ধু প্রণবকে গিয়ে জানালো রাত্তিরের ঘটনা। সব শুনে সে চুপ করে রইলো। মনে হোলো বেশ খুসিই হয়েছে সে।

অনেকক্ষণ পরে বললো, "আজ রাত্তিরে আমিও তোমার সঙ্গে থাকবো।"

সেদিন রাত্তিরে প্রণব সোমনাথের বাড়ী এসে রাত কাটালো। দুজনেই বিছানার উপর জেগে বসে রইলো অনেকক্ষণ। কিন্তু আর কোনো ঘটনা ঘটলো না। ঘুমিয়ে পড়লো দুজনেই।

সকাল বেলা ঘরের চারিদিক খুঁজে দেখলো সোমনাথ। কুকুরের পায়ের চিহ্ন আর নেই আগের মতো। সোমনাথের মুখে এক নিশ্চিন্ত পরিতৃপ্তি।

প্রণব বললো, "বাঁচা গেল। কুকুরটা চিরকালের মত তোমার জীবন থেকে বেরিয়ে চলে গেছে।"

"এ কথা কেন বলছো," সোমনাথ জিজ্ঞেস করলো। উত্তরে প্রণব যা বললো তাতে সোমনাথের চক্ষুস্থির।—অনেক বছর আগে এ বাড়ীতে একদিন রাত্তিরে চোর ঢুকেছিলো। তখন যিনি থাকতেন চোরকে গুলি করেন। গুলি বুকে লেগে চোর সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়।

তারপর থেকে শোনা যেতো বাড়ীর প্রত্যেক নতুন ভাড়াটেই নাকি মাঝরাতে দেখতো একটি ছায়া শোয়ার ঘরের দরজা খুলে ঘরের ভেতর ঢুকে হাওয়ায় মিলিয়ে যেতো। লোকে ভয় পেয়ে আর এ বাড়ী ভাড়া নিতে চাইতো না।

"আমি জানতাম যে তোমার কুকুরের একটি জেদ ছিলো," প্রণব বললো, "যতোক্ষণ চোর না ধরতে পারতো সে, কিছুতেই বাড়ী ফেরানো যেতো না তাকে। তাই তোমার কথা শুনে আমার মনে হোলো তোমার ওই কুকুরটি যদি একবার ঐ চোরের পেছনে লেলিয়ে দেওয়া যায়, তা হলে তুমি নিষ্কৃতি পাও। যাক আশা করি তোমার কুকুর অনন্তকাল ধরে ওই চোরকে তাড়া করে বেড়াবে। তোমার ঘুমের ব্যাঘাত হবে না।"

যাই হোক, সেই বিশ্বস্ত কুকুরের স্মৃতি সোমনাথ মন থেকে মুছে ফেললো। তার বিয়ে হয়ে গেল কয়েকমাস পরে। বিয়ে করে সে আরেকটা বাড়ীতে উঠে গেল যাতে, তার কুকুর যদি কোনোদিন ফেরেও বা, তাকে আর খুঁজে পাবে না ; আস্তে আস্তে পাঁচ বছর কেটে গেল। তার কুকুর-প্রীতি একেবারে ঘুচে গেল। কুকুর পোষা সে ছেড়ে দিলো।

সিদ্ধার্থ বোসের গল্প শুনে সবাই হেসে ফেললো। "বেশ মজার ঘটনা তো! সত্যি সত্যি এবকম হতে পারে নাকি," বললে বনানী মৈত্র।

"দাঁড়ান, এখনো গল্প শেষ হয়নি," বলে গেল সিদ্ধার্থ বোস, "আমি গল্পটা প্রণবেব কাছে শুনেছি তিন চার বছর আগে। গল্পেব শেষটুকুও তারই কাছে শুনলাম দু-তিন দিন আগে।

সেদিন সোমনাথ অফিস থেকে ফিবতে তার বৌ বললে,—জানো, ইদানিং একটা মজার ব্যাপার ঘটছে আজ তিনদিন থেকে। প্রত্যেক-দিন কোত্থেকে একটা এ্যালসেশিয়ান কুকুর আসছে আমাদের বাড়ি। আমায় দেখে খুব ল্যাজ নাড়ে। প্রথম দিন আমি ভয় পেয়েছিলুম। কিন্তু দেখলাম সে খুব ভালো কুকুর। কিচ্ছু বলে না। তবে ওর কাছে গেলেই সে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যে কোথায় ছুটে পালিয়ে যায় বুঝতে পারি না।

কী সর্বনাশ —বললো সোমনাথ। তারপর মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম।

প্রণবই বুঝিয়ে দিলো ব্যাপারটা কি ঘটেছে। চার পাঁচদিন আগে একটি পুলিস সে রাস্তায় ট্রাক চাপা পড়ে মারা যায়। প্রণবের ধারণা সোমনাথের কুকুর সেই পুলিসের সহায়তা পেয়েছে কোনো না কোনোরকম ভাবে। তারপর যখন সেই কুকুরের আর

কিছু করবার ছিলো না, সে ফিরে এলো সোমনাথের কাছে। আর যাই হোক, খুব বিশ্বস্ত প্রভুভক্ত কুকুর তো!"

গল্পের শেষটুকু শুনে হঠাৎ চুপ করে গেল ঘরশুদ্ধ সবাই। বনানীর এ্যালসেশিয়ানের বাচ্চাটি ছিলো মীনা সেনের কোলে। সে আস্তে আস্তে সেটিকে নিচে নামিয়ে দিলো।

সেইবার আই-এ পরীক্ষার সময় কোনো এক ছাত্রের প্রাইভেট টিউটার ছাত্রের হয়ে পরীক্ষা দিতে বসে গার্ডের হাতে ধরা পড়ে যায়। তাই নিয়ে আলোচনা হচ্ছিলো একদিন রোববার সন্ধ্যায়।

কান্তি রায়চৌধুরী বললো, "আশ্চর্য! নিজের ছাত্রকে পরীক্ষা পাশ করানোর জন্যে কোনো প্রাইভেট টিউটার এতখানি করতে পারে?"

"এ তো কিছুই নয়," মীনা সেন উত্তর দিলো, "আমার এক প্রাইভেট টিউটার ছিলো। আমায় পরীক্ষা পাশ করানোর জন্যে সে যা করেছে, তার তুলনা হয় না।"

সবার অনুরোধে মীনা সেন সুরু করলো তার প্রাইভেট টিউটারের গল্প।

"সে সময় আমি বি-এ পরীক্ষা দিচ্ছি,"—সুরু করলো মীনা সেন।—"আমি তখন ইকনমিক্সে অত্যন্ত কাঁচা। পাশ করবার সম্ভাবনা নেই বললেই হয়। তখন একদিন আমার এক মামাতো ভাই বিপিনবাবু নামে এক ভদ্রলোককে নিয়ে এলো আমার পড়াবার জন্যে।

এই বিপিন ঘোষের বয়েস তখন প্রৌঢ়ত্বের সীমায় এসে গেছে। ভালো প্রাইভেট টিউটার বলে ছাত্রমহলে খুব নাম। তাঁর কোনো ছাত্রই নাকি কোনোদিন ফেল করেনি কোনো পরীক্ষায়। সুতরাং তাঁর চাহিদা খুব।

তাঁর এই সাফল্য ও খ্যাতির একমাত্র কারণ ছিলো একটি অসাধারণ গুণ যেটা সচরাচর অন্য প্রাইভেট টিউটারদের মধ্যে দেখা যায় না। সেটা আর কিছু নয়, শুধু পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের সম্ভাব্য প্রশ্নগুলি আগেভাগে জেনে যাওয়ার অনন্যসাধারণ কুশলতা। এটা তিনি কি করে পারতেন সেকথা কেউ জানতো না, বুঝতেও পারতো না। মাস্টার হিসেবে তিনি মোটেও ভালো ছিলেন না, পড়াতে পারতেন না, পড়াবার চেষ্টাও করতেন না। তাঁর সময়ের কোনো ঠিক ছিল না, বেশীক্ষণ বসতেন না, যতক্ষণ বসতেন পড়ার বই ছুঁতেই চাইতেন না। যে বিষয় পড়াতে হবে সে বিষয় ছাড়া অন্য সমস্ত বিষয়ের উপরই একটা বক্তৃতা শোনাতেন। তারপর হঠাৎ উঠে পড়তেন। বেশিরভাগ দিনই যাওয়ার আগে টাকা ধার চেয়ে বসতেন ছাত্রের কাছে, নয়তো বা আগাম চেয়ে নিতেন মাইনের টাকাটা।

ওদিকে হয়তো পরীক্ষা এগিয়ে আসছে। অথচ মাস্টারমশায়ের কোন মাথা ব্যথা নেই। এদিকে পরীক্ষার ভাবনায় ছাত্রের চোখে ঘুম নেই, কারণ বিপিনবাবু যে সাবজেক্ট পড়ান, তার কিছুই জানে না ছাত্রটি। তারপর পরীক্ষার দিন সাত আট যখন বাকী, বিপিনবাবু এসে হয়তো দশটা প্রশ্ন আর তার উত্তর তৈরী করে লিখে এনে দিলেন। ব্যস, ছাত্রটি নিশ্চিন্ত। তার কাজ শুধু সেগুলো মুখস্থ করা। যথা সময়ে দেখা গেল যে বিপিনবাবুর ছাত্র পরীক্ষার উদ্দাম সমুদ্র বেশ ভালো ভাবেই অতিক্রম করে গেছে।

বিপিন ঘোষ আমাকেও পড়াতেন তাঁর চিরাচরিত পদ্ধতি অনুযায়ী। ইচ্ছে মতো আসতেন, বসে গল্প করতেন, তারপর কিছু টাকা ধার বা আগাম নিয়ে চলে যেতেন। এভাবে চললো পরীক্ষার আট নয় দিন আগে পর্যন্ত। আমি নিশ্চিন্ত। কারণ, আমি জানি যে যথা সময়ে উনি আমায় প্রশ্ন আর উত্তর তৈরী করে দেবেন। সেগুলো মুখস্থ

করলেই কাজ হবে। ইকনমিক্স জানি বা না জানি কিছুই আসে যায় না, পরীক্ষায় পাশ করে যাবো ঠিকই।

কিন্তু ঠিক সেই সময়েই হঠাৎ বিপিন ঘোষের আর পাত্তা নেই। ভাবলাম হয়তো বা তাঁর অসুখ করেছে, নয়তো বা হয়েছে একটা কিছু। কিন্তু তারপর দিনও যখন তাঁর দেখা নেই, তার পরের দিনও না, আর পরীক্ষার মোটে চারদিন বাকী তখন রীতিমতো ভয় পেয়ে গেলাম। তাঁর ঠিকানা জানা ছিলো না, কারণ কোনোদিন তাঁর ঠিকানা রাখবার প্রয়োজন বোধ করিনি। খোঁজ করলাম তাঁর অন্যান্য ছাত্রদের কাছে। দেখা গেল, ওরাও কেউ তাঁর ঠিকানা জানে না।

তখন আমার এক নিঃসহায় অবস্থা। পরীক্ষার মোটে চারদিন বাকী। অথচ ইকনমিক্স একেবারে তৈরী হয়নি। মাথার চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে পাগলের মতো একবার শেষ চেষ্টা করলাম সস্তা বাজারের নোট পড়ে যা হোক একটুখানি তৈরী হবার। তাতে সব কিছু আরো বেশি গুলিয়ে গেল।

পরীক্ষার দিন-দুই আগে একদিন রাত্তিরে বাড়ির সবাই বাইরে কোথায় যেন নেমন্তন্ন খেতে গেছে। আমার পরীক্ষা সামনে বলে আমি যাইনি। বাড়িতে শুধু আমি আর আমার ছোটো ভাই একা। সে ঘুমোচ্ছিলো পাশের ঘরে। আমি পড়ার ঘরে মাথায় হাত দিয়ে একলা বসে। কী পড়বো, কি করে সব তৈরী হবে কিছুই ভেবে পাচ্ছিলাম না। আকাশে তখন একটি ফ্যাকাসে চাঁদ যেন ঘুমে ঢুলছে। চারদিকে একটু শীত-শীত।

হঠাৎ শুনলাম নিস্তব্ধ পথে ভারী জুতোর আওয়াজ, খুব চেনা পায়ের আওয়াজ। ডাস্টবিনের পাশে একটি নিঃসঙ্গ কুকুর ডেকে উঠলো।

দরজায় বেল বাজলো। ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিলাম। বললাম, "কোথায় ছিলেন এদ্দিন, মাস্টারমশাই? আমি কি করে ইকনমিক্সে পাশ করবো?"

বিপিন মাস্টার কোনো উত্তর দিলেন না। একটি ফ্যাকাসে আশ্বাসের হাসি বিকীর্ণ করলেন মুখের উপর। মনে হোলো যেন উনি বড়ো ক্লান্ত। ভেতরে আসতে বললাম। কিন্তু এলেন না। একগোছা কাগজ গুঁজে দিলেন আমার হাতে। বললেন, যা যা প্রশ্ন তৈরী করতে হবে সে সব ওতে করে দেওয়া আছে। তারপর অন্য দরকারী কাজ আছে বলে চলে গেলেন।

ইকনমিক্সের সাজেশানগুলো পেয়ে আমি খুব খুশী। দিন-দুই বসে প্রাণপণে মুখস্থ করলাম সব প্রশ্নের উত্তর। তারপর পরীক্ষার হলে গিয়ে পরীক্ষায় এসেছে আমার সব জানা প্রশ্ন।

পরীক্ষা শেষ হতে, খাতা সাবমিট করে যখন হল থেকে বেরিয়ে এলাম, তখন আরেকটি মেয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো, "কি রকম হোলো ?"

"বেশ ভালো," আমি উত্তর দিলাম।

"তুমি তো বিপিন ঘোষের কাছে কিছুদিন ইকনমিক্স পড়েছো, তাই না ? বেচারা বিপিন মাস্টার !"

তার কথায় বেদনার ব্যঞ্জনা আমায় একটু অবাক করলো। "কেন ?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"সে কি ? তুমি শোনো নি ?" বললো আমার সেই বন্ধু, "বিপিন মাস্টার এক মোটর এ্যাকসিডেন্টে মারা গেছেন।"

শুনে আমার মুখে আর কথা নেই। কোনো রকমে জিজ্ঞেস করলাম, "কবে ?"

"বেশ কিছুদিন হোলো। দিন সাত-আট হবে," সে উত্তর দিলো।

আমি মনে মনে একবার দিনগুলো হিসেব করলাম। তারপর— তারপর আমি হঠাৎ মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলাম পরীক্ষার হলের বাইরের পোর্টিকোতে। কেন আমার ও-রকম হোলো সেকথা আজো আমার

বন্ধুদের কাছে একটা রহস্য। অনেকে অনেক কথাই বলেছিলো—কিন্তু আসল ব্যাপারটা আমি কারো কাছে আর ভাঙিনি। বললে কেউ বিশ্বাস করতো না।"

মীনা সেনের কাহিনী সবাই চুপচাপ শুনলো। তারপর কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর কান্তি রায়চৌধুরী অন্য প্রসঙ্গ পাড়লো। প্রাইভেট টিউটারদের সম্বন্ধে আর কোনো আলোচনাই কারো করবার ইচ্ছে হোলো না।

অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি। দিনগুলো তখনো বেশ গরম। বনানী মৈত্র সেদিন রোববার বিকেলে সবাইকে বরফ-দেওয়া চা তৈরী করে খাওয়ালো।

"বিভূতি কোথায়?" অপূর্ব লাহিড়ি জিজ্ঞেস করলো, "তাকে দেখছি না কেন?"

রোববারের আসরে বিভূতি আসে সবার আগে। বনানীকে অন্তত দশ মিনিটের জন্যে হলেও একলা পাওয়ার চেষ্টা করে। সেদিন বিভূতিকে দেখতে না পেয়ে সবাই একটু অবাক হোলো।

বিভূতি এলো শেষ পর্যন্ত, কিন্তু দেরী করে এলো, সে বাড়ি বদলে একটি নতুন ফ্ল্যাটে উঠে গেছে। সারাদিন ঘরদোর গোছানোতে ব্যস্ত ছিলো তাই দেরি হয়েছে।

অমরেশ গুপ্ত জিজ্ঞেস করলো, "ভাড়া কতো?"

"একশো পঁচিশ," বিভূতি সগর্বে বললো, "চারখানা কামরা।"

"চার কামরার ফ্ল্যাট একশো পঁচিশ?" অবাক হোলো কান্তি রায়চৌধুরী, "এত সস্তা? এ ভাড়ায় এখনো বালিগঞ্জে ঘর পাওয়া যায়?"

"লোকে বলে ওই বাড়িতে ভূত আছে", বিভূতি উত্তর দিলো, "তাই কেউ ভাড়া নিতে চায় না।"

সবাই হেসে ফেললো। পূর্ণাংশু গুহ জিজ্ঞেস করলো, "কি ভূত বাড়িওয়ালা ভূত না ভাড়াটে ভূত?"

"মানে?"

"ও। এই রহস্য জানো না? আমার চেনা এক বাড়িওয়ালা আছে। যখনই তার বাড়িভাড়া বাড়িয়ে দেওয়ার ইচ্ছে হয় বা ভাড়াটে তাড়াবার ইচ্ছে হয়, সে মামলা মোকদ্দমা করে না। কাউকে ভূত সাজিয়ে ভাড়াটেকে ভয় দেখায়। ভাড়াটে তাড়ানোর জন্যে এর চেয়ে সোজা রাস্তা আর নেই। একবার কি হোলো, একজন ভাড়াটে মারা গেল ওই বাড়িতে। অন্যান্য ভাড়াটেদেব রাগ ছিলো বাড়িওয়ালার উপর। ওরা রটিয়ে দিল ওই বাড়িতে ভূত আছে। নতুন ভাড়াটে এলে নানারকম উপদ্রব হতে লাগলো। করলো নিজেরাই, দোষ চাপালো ভূতের ঘাড়ে। নতুন ভাড়াটে পালিয়ে গেল বাড়ি ছেড়ে। তারপর আর কেউ ওই ফ্ল্যাট ভাড়া নিতে চায় না। বাড়িওয়ালা পড়লো ফ্যাসাদে। তারপর অন্যান্য ফ্ল্যাটের ভাড়াটেদের সঙ্গে একটা আপোষ-নিষ্পত্তি হোলো। তাদের বাড়িভাড়া কমিয়ে দিতে হোলো। আরেকটি নতুন ভাড়াটে এলো। অন্য ভাড়াটেরাও রেণ্ট-কন্ট্রোল না কবেই কম ভাড়াতে থাকতে লাগলো।"

যে যার খুশিমতো বাস্তু-ভূতের নানাবকম কাহিনী শোনাতে লাগলো।

তখন একজন বললো, "কলকাতায় কিন্তু আজকাল আর ভূতুড়ে বাড়ি পাওয়া যায় না। লোক এত বেড়ে গেছে যে ভূতেরা শহর ছেড়ে পালিয়েছে।"

মৃগাঙ্ক রায় বললো, "একেবারে নেই বলা যায় না। আমি অন্তত একটি বাড়ির কথা জানি যেখানে এখনো একটি ভূত নির্বিঘ্নে বসবাস করছে।"

"কোথায়? ভাড়া কতো?" জিজ্ঞেস করলো সুপ্রকাশ দত্ত মজুমদার। তার বাড়িওয়ালা তাকে উঠে যেতে নোটিশ দিয়েছে। তার শিগগিরই একটি বাড়ি দরকার।

"আর্লিংটন স্কোয়ারে। তবে সে বাড়ি পাওয়া যাবে না। কারণ সে বাড়িতে এখন ভাড়াটে আছে।"

"ভূতুড়ে বাড়ি হওয়া সত্ত্বেও?" মীনা সেন চক্ষু বিস্ফারিত করে জিজ্ঞেস করলো, "ওর ভয় করে না?"

মৃগাঙ্ক হাসলো।

"আপনি কি করে জানেন সে বাড়িতে ভূত আছে?"

"আমি ওখানে একবার একরাত থেকে এসেছি" মৃগাঙ্ক উত্তর দিলো।

সবাই তখন মৃগাঙ্ককে চেপে ধরলো ঘটনাটা শোনাবার জন্যে।

"আর্লিংটন স্কোয়াবের বাড়িটি অনেকদিন খালি পড়ে ছিলো",—মৃগাঙ্ক সুরু করলো তার গল্প।—"লোকে নানারকম গল্প বলতো, সে বাড়ির সম্বন্ধে। কে নাকি সারাবাত বাড়িতে ঘুবে বেড়ায়, সিঁড়ি দিয়ে দুপদাপ করে নামে, শোয়ার ঘরেব দরজা ধাক্কা দেয়, চেয়ার উল্টে ফেলে দেয়, কাচের বাসন ভেঙে চুরমার করে বাখে, এসব নানারকম কাহিনী, যা বিভিন্ন ভূতের বাড়ির অদেখা ভূতদের সম্বন্ধে পাওয়া যায় লোকের মুখে শোনা বা মাসিক পত্রিকায় ছাপানো ভূতের গল্পে। সুতরাং কলকাতায় খালি বাড়ি পাওয়া ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠলেও কেউ ও বাড়ি ভাড়া কবতে যেতো না।

গত বছর আমার বন্ধু উৎপল সেনগুপ্ত লক্ষ্ণৌ থেকে বদলি হয়ে কলকাতায় এলো। এ বাড়ির খবব পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে বাড়িটা ভাড়া নিয়ে নিলো। এত সস্তায় এত ভদ্র পাড়ায় এত ভালো বাড়ি পাওয়া যায় না। পড়শীরা এসে তাকে নানারকম বোঝালো, একটি বাড়িতে এক খামখেয়ালী ভূতের সঙ্গে বসবাস করা যে নিরাপদ নয় সেকথা তাকে অবধান করানোর চেষ্টা করলো।

যখন জানতে পারলো যে সে অবিবাহিত, একাই থাকবে শুধু চাকর নিয়ে তখন আরো শঙ্কিত হোলো, কারণ ভূত নাকি এক মহিলার। কিন্তু উৎপল তাদের কথা শুধু হেসে উড়িয়ে দিলো।

সারাদিন বাড়িতে আসবাবপত্র সাজিয়ে গুছিয়ে ঠিকঠাক করে বিকেলে এলো আমার কাছে। ওর কাছে সব কথা শুনে আমি হাসতে হাসতে বললাম, "তোমায় হিংসে হচ্ছে। তুমি বেশ আরামে এক মহিলার সাহচর্য উপভোগ করবে।" তারপরই মাথায় একটা মতলব এলো। তাকে বললাম, "এক কাজ করা যাক। আজ রাত্তিরে আমিও তোমার সঙ্গে থাকবো। কি বলো ?"

"কেন ?" সে জিজ্ঞেস করলো, "তুমি কি ভাবছো আমি ভয় পাবো ?"

"না, তা নয়," আমি উত্তর দিলাম, "তবে শ্রীমতী অশরীরী যদি উৎপাত করে, তাকে সামলাতে হলে একজনের জায়গায় দুজন হলে সুবিধা হয়।"

"দেখ, তিনি ভূত হলেও একজন ভদ্রমহিলা," উৎপল হাসতে হাসতে বললো, "তাঁর সম্বন্ধে কোনো অসম্মানজনক উক্তি করবে না।"

"শুধু মহিলাতে রক্ষে নেই," আমি বললাম, "তার উপর ভূত, সুতরাং কতোখানি জ্বালাতন সে করতে পারে একবার ভেবে দেখো।"

"তুমি থাকলে সে লজ্জায় আমার সামনে নাও বেরোতে পারে উৎপল বলে উঠলো।

এমনিভাবে খুব হাসিঠাট্টা করলাম আমরা দুজন। যাই হোক শেষ পর্যন্ত সে আমায় তার সঙ্গে একরাত কাটাতে রাজী হোলো। জীবনের বহু এ্যাড্‌ভেঞ্চার আমরা একসঙ্গে করেছি, এই নতুন অভিজ্ঞতাও ভাবলাম একসঙ্গেই করা যাবে।"

যাই হোক, রাত্তিরে খাওয়া দাওয়ার পর সে হুইস্কির বোতল বার করলো। দুজনে হুইস্কি খেতে খেতে পুরোনো দিনের অনেক গল্প করলাম—দুজন অবিবাহিত বন্ধুর অনেকদিন পরে দেখা হলে

পুরোনো দিনের যে সব গল্প করে সে সব গল্প। সে খুব মশগুল ছিলো, কিন্তু আমি ছিলাম কান খাড়া করে—যদি কোথাও কোনো অস্বাভাবিক শব্দ শোনা যায়। লক্ষ্য করতে লাগলাম প্রত্যেকটি ছায়া, নজর রাখলাম আশেপাশের অন্ধকারে। কিন্তু কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই। চারদিক শান্তিময়, স্তব্ধ, নিঝুম।

তখন সাড়ে দশটা প্রায় বাজে। এ অঞ্চল নিথর হয়ে পড়েছে এরই মধ্যে। বেশির ভাগ বাড়ীর জানালাই অন্ধকার। বাড়ীর ছাতে ছাতে রেডিওর এরিয়েলগুলো হাওয়ায় একটু একটু দুলছে। তাদের পেছনে তারা ঝিকমিক করছে মসী কৃষ্ণ আকাশে। পার্কের ওপারের এক বাড়ী থেকে খুব অস্পষ্ট রেডিওর যন্ত্র সঙ্গীত ভেসে এলো।

"একটু গান শোনা যাক," হুইস্কির আবেশে উৎপল বললো, "যদি আমাদের শ্রীমতী ভূত দেবী গান ভালবাসেন তিনিও এসে আমাদের সঙ্গে বসে রেডিও শুনতে পারেন। তার যদি আপত্তি না থাকে আমি থাকে আমি তাকে হুইস্কিও খাওয়াতে পারি।"

কি জানি কেন, উৎপলের এই ঠাট্টা আমার ভালো লাগলো না। কিছু বললাম না। আলো নিভিয়ে দিয়ে উৎপল রেডিও চালিয়ে দিলো, আমি শুনতে লাগলাম চুপচাপ। কে যেন সেতার বাজাচ্ছিলো। ভারী মিঠে হাত। শুনতে শুনতে হুইস্কি আর সুরের আবেশে আমার চোখ ঘুমে ভারী হয়ে এলো।

উৎপলও ঘুমিয়ে পড়লো বোধ হয়।

একটু পরেই জেগে উঠলাম। কিন্তু মনে হোলো যেন অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছে। কিন্তু দশ পনেরো মিনিটের বেশী নিশ্চয়ই নয়, কারণ রেডিওতে তখন গান হচ্ছে। এগারোটা না বাজলে রেডিওর প্রোগাম সমাপ্ত হবে না।

ভারী সুন্দর ঠুমরী গাইছিলো। খুব তৈরী গলা সেই মেয়েটির।

মনে হোলো যেন উৎপলও জেগে গেছে। সেও গান শুনছে। মন দিয়ে। এত সুন্দর ঠুমরী খুব কম শোনা যায়।

সে আমায় জিজ্ঞেস করলো, "জেগে আছো নাকি ?"

"হ্যাঁ", আমি উদ্ধার দিলাম, "তুমি ঘুমোও নি ?"

"ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বোধ হয়।" সে বললো, "আবার জেগে গেছি আলো জ্বালিয়ে দেবো।"

"না, না, কোনো দরকার নেই", আমি মানা করলাম, "অন্ধকারে শুয়ে গান শুনতে খুব ভালো লাগছে।"

শুনতে শুনতে ঘুমে চোখ ভারী হয়ে এলো, তবু গানটা সবটুকু শুনবো বলে জোর করে জেগে রইলাম, গান যখন শেষ হোলো একটি মহিলা কণ্ঠ গায়িকার নাম ঘোষণা করলো—এতক্ষণ আপনাদের গান ঠুমরী গেয়ে শোনালে মেনকা মিত্র। আমাদের আজকের অধিবেশন…

হঠাৎ আমার কেমন যেন মনে হোলো যে গলার গান শুনেছি, সে গলাই যেন নাম ঘোষণা করলো। নাঃ, নিশ্চয়ই আমার শোনার ভুল, আমি ভাবলাম, হুইস্কির মাত্রাটা একটু বেশী হয়ে গেছে।

রেডিওতে সময় সঙ্কেত শোনা গেল।

ঢং—ঢং—তিন—চার—আমি শুনতে লাগলাম নিজের মনে—ঢং ঢং—সাত—আট—ঢং ঢং—এগারো—ব্যস, শেষ হোলো। না তো—ঢং—আরো একটা। বারোটা ? সে কি! সে কি করে হতে পারে ?

উৎপলও বলে উঠলো, "বারোটা ? না, নিশ্চয়ই ভুল গোনা হয়েছে। আবার গুনে দেখ," সে জড়িয়ে জড়িয়ে বললো।

"আচ্ছা, আবার শোনা যাক," বলে আমি অপেক্ষায় রইলাম, কিসের কে জানে। পরমুহূর্তেই খেয়াল হোলো, বললাম—"আরে আবার গুনবো কি ? নেশা কি তোমার একটু বেশী হয়েছে নাকি ? টাইম সিগন্যাল একবারের বেশী তো হয় না।"

"উঠে ঘড়ি দেখ," সে বললো।

"দূর, কে মাথা ঘামায়," আমি উত্তর দিলাম,—"এগারোটায় রেডিওর প্রোগ্রাম শেষ হয়। এখন এগারোটার টাইম সিগন্যাল হোলো, আমরা শুনতে ভুল করেছি।"

আমরা দুজনেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকাল বেলা উঠে চা ডিম টোষ্ট উড়িয়ে যখন দুজনে বেরিয়ে পড়বার উপক্রম করছি, তখন উৎপল বললো—"তাহলে এই হোলো আমাদের ভূতুড়ে বাড়ি? এত আরামে আমি বহুকাল ঘুমাই নি।"

আমি হাসতে হাসতে বললাম, "কে জানে, হয়তো তোমার কথাই ঠিক। আমি ছিলাম বলে সে লজ্জায় বেরোয় নি। তুমি একলা থাকলে ঠিক আসবে।"

এমন সময় দরজায় বেল বাজলো। দরজা খুলে দেখি আমাদের প্রতিবেশী এক ভদ্রলোক বেড়াতে এসেছেন। উৎপলের সঙ্গে আগের দিন আলাপ হয়েছিলো, বুঝলাম ভদ্রলোক সন্ধান নিতে এসেছেন আমাদের কোনো রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা হয়েছে কি না।

উৎপল তাকে এককাপ চা করে দিলো। "কাল রাত্তিরে ভালো ঘুম হয়েছিলো তো?" তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

"হ্যাঁ, খুব ভালো ঘুম হয়েছিলো," উৎপল উত্তর দিলো, "কই তিনি তো আসেন নি!"

"তিনি? তিনি কে?" ভদ্রলোক অবাক হয়ে তাকালেন।

"সেই যে মেয়ে ভূত, যার কথা আপনারা সেদিন বলছিলেন আমায়," উৎপল বললো।

আমি তাদের কথাবার্তায় যোগ দিইনি, অন্য কথা ভাবছিলাম! ওদের কথার মাঝে মাঝে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা, কাল রেডিওতে এগারটার টাইম-সিগন্যাল বারোটায় হোলো কেন?"

"দেখছি এখনো তোমার খোয়াড়ি ভাঙ্গে নি," উৎপল বলে উঠলো, "তুমি ভুল শুনেছিলে।"

"তুমিও কি ভুল শুনেছিলে," আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"দেখ, হুইস্কি আমরা দুজনেই টেনেছিলাম," সে উত্তর দিলো।

আমি একটু ভেবে জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা, রেডিওটা বন্ধ করে দিয়েছিলো কে?"

"কেন? তুমিই তো বন্ধ করেছিলে," উৎপল বললো, "আমি যখন করি নি, সুতরাং তুমিই করেছিলে।"

আমি জানালাম, "না, আমি বন্ধ করি নি, আমি মনে করেছিলাম তুমিই রেডিও বন্ধ করেছো।"

উৎপল মাথা চুলকোতে লাগলো। প্রতিবেশী ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, "কি ব্যাপার।"

"না, কিছুই না।" উত্তর দিলো উৎপল, "যাই হোক, গানটা গেয়েছিলো খুব ভালো। কি বলো মৃগাঙ্ক?"

"কোন গান?" আবার জিজ্ঞেস করলেন সেই প্রতিবেশী।

"কাল রাত্তিরে রেডিওতে সবার শেষে যে গানটি হয়েছিলো," উত্তর দিলো উৎপল, "ভারী সুন্দর জমেছিলো মেয়েটির ঠুমরী।"

"আপনি ভুল করছেন," প্রতিবেশী ভদ্রলোক বললেন, "কাল রেডিওতে সবার শেষে হয়েছিলো নজীবুল্লা খানের সেতার। আমি নিজে শুনছিলাম।"

আমি বেতার-জগৎ খুলে দেখলাম। দেখে আমি অবাক। উৎপলকে দেখালাম। হ্যাঁ, প্রতিবেশী ভদ্রলোক ঠিকই বলেছেন।

"তাহলে সেই মেনকা মিত্র মেয়েটি কে?" জিজ্ঞেস করলো উৎপল।

"কী? মেনকা মিত্র???" চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন সেই প্রতিবেশী ভদ্রলোক।

তাঁর কাছে শুনলাম।

এই বাড়িতে একটি মেয়ে থাকতো, নাম মেনকা মিত্র। খুব ভালো খেয়াল আর ঠুমরী শিখেছিলো। রেডিওতে গাইবার সখ ছিলো খুব। অডিশান দিয়ে চেষ্টা চরিত্র করে প্রোগ্রাম পেলো বটে, কিন্তু প্রোগ্রামের তিন দিন আগে হোলো মেনিনজাইটিস। যেদিন তার গান গাইবার কথা সেদিনই সে মারা যায়।

মৃগাঙ্ক রায়ের গল্প শেষ হোলো। কান্তি রায়চৌধুরী চুপচাপ সিগারেট টানছিলো। আস্তে আস্তে তার বৌকে জিজ্ঞেস করলো, "আজ রাত্তিরে সবার শেষে কার গান আছে।"

"যারই থাক," মিসেস্ রায়চৌধুরী বললো, "আজ আমি রেডিও চালাতে পারবো না। আমার ভয় করবে।"

"বাঁচা গেল," বলে সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেললো কান্তি রায়চৌধুরী।

প্রেমের গল্প লিখে নাম করেছে প্রতাপ মুখার্জী। বনানী মৈত্রের বাড়ীতে রোববারের বৈঠকে তাকে একদিন ধরে নিয়ে এলো পরিমল সেনগুপ্ত।

সেদিন গল্প বলার পালা শেখর গাঙ্গুলীর। সে নাকি ফ্রান্সে গিয়ে একটি ভুতুড়ে-ক্লাবে রাত কাটিয়ে এসেছে। সেদিন সেই কাহিনী শোনানোর কথা। সবাই খুব উৎসুক। শেখরের খুব গুরুগম্ভীর ভাব। চায়ের পাট না চুকলে গল্প বলা আরম্ভ হয় না। তাই চা খেতে খেতে সবাই এমনি গল্প করছিলো নিজেদের মধ্যে!

আসরে অভ্যাগত ছিলো আরো একজন সুপরিচিত লেখক, নির্মলেন্দু হালদার। বনানী তাকে জিজ্ঞেস করলো, "দিলীপবাবুদের কাগজের ভৌতিক সংখ্যার জন্যে এবার কি লিখছেন?"

"কিছুই ভেবে ঠিক করিনি," নির্মলেন্দু বললো, "ভূতের গল্পের প্লট আমার মাথায় আসে না। দেখি শেখরবাবুর গল্পটা শুনে যদি কোনো মাল-মশলা পাওয়া যায়।"

মীনা সেন বলে উঠলো, "আপনি তো বেশ লোক! আমাদের এখানে গল্প বলা হবে, আর আপনি সেটা লিখে ছাপিয়ে দেবেন?"

"কি আর করি বলুন," নির্মলেন্দু উত্তর দিলো, "অন্য যে কোনো গল্পের মাল-মশলা আমাদেব চার পাশেই পাওয়া যায়। কিন্তু ভূতের গল্পের প্লট কোথায় পাই বলুন?"

"কোনো ভূতুড়ে বাড়িতে রাত কাটিয়ে আসুন না," বললো বনানী মৈত্র, "ভূতেব গল্পেব প্লট ভূতেব মুখ থেকে শুনে আসবেন।"

প্রতাপ মুখার্জী আস্তে আস্তে বললো, "সে কাজটি কখনো করবেন না।"

সবাই তাকালো প্রতাপ মুখার্জীব দিকে!

"একবার ভূতেব গল্পেব প্লটের সন্ধানে বেরিয়ে যা অভিজ্ঞতা হয়েছে," প্রতাপ বললো, "আব ভূতেব গল্প লিখিনা তার পর থেকে। দিলীপ কতোবার বলেছে, কিন্তু আমি রাজী হইনি।"

সবাই প্রতাপ মুখার্জীকে ধবে পডলো তার অভিজ্ঞতার কাহিনী শোনাবাব জন্যে।

"খুব বেশীদিন আগের কথা নয়"—প্রতাপ মুখার্জী সুরু করলো—"বছর তিন চার হবে। দিলীপ সেবাব প্রথম ওদের কাগজের ভৌতিক সংখ্যা বার করছে। ওরা আমার খুব বন্ধু। আমায় এসে চেপে ধরলো, একটা ভূতের গল্প লিখে দিতে হবে। ভাবলাম, মন্দ কি, একবার চেষ্টা কবে দেখা যাক। অন্য গল্প লিখতে গেলে তো মনগড়া কিছু লেখা যায় না, বাস্তবের সঙ্গে একটা মিল রাখতেই হয়। কিন্তু ভূতের গল্পে সে সব ল্যাঠা নেই। মূল্যের

মতো দাঁত আর ভাঁটার মতো র্চোখ বনা করে কিছু সানুনাসিক সংলাপ দিয়ে একটা দাঁড় করালেই হোলো।

কিন্তু লিখতে বসে দেখি সে আর হয় না। চিরকাল প্রেমের গল্প লেখা অভ্যেস, ভূতের গল্প লিখতে গিয়েও সেই একই টেকনিক, একই আবহাওয়া এসে পড়ছে। হয় নায়কের সঙ্গে মেয়ে ভূত প্রেম করছে নয়তো বা নায়িকার সঙ্গে ছেলে ভূত প্রেম করছে, কিংবা হয়তো নায়ক আর নায়িকা প্রেম করছে এবং মা-বাবা টের পাচ্ছে না দেখে, বহুদিন আগে মবে ভূত হয়ে যাওয়া ঠাকুর্দা ঠাকুরমায়েরা নিজেরা গার্জিয়ান হয়ে বসে ওদেব ভয় দেখাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত বহু চেষ্টা করে একেবারে ভূত নায়ক আর ভূত নায়িকা যদিও বা করলাম, তখনও দেখি ওবা ওবা আবার প্রেম করতে বসে গেছে শেষের কবিতাব নায়কেব স৲লাপে চন্দ্রবিন্দু লাগিয়ে। দেখলাম, এতেও চলবে না। ভূত চবিত্র হলেই চলবে না, একটা ভয়ের আবহাওয়া চাই। কিন্তু অভিজ্ঞতা না হলে সে আবহাওয়া সৃষ্টি হবে কি করে!

তখন এক বাড়ির দালালকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা, আপনার সন্ধানে কি এমন বাড়ি বা জায়গা জানা আছে যেখানে ভূত-টুত আছে বলে শোনা যায়!"

সে প্রথমটায় খুব অবাক হোলো। তারপর একটু ভাবলো। ভেবে বললো, "সন্ধান দু-একটা যে দিতে পারি না তা নয়, তবে সে সব জায়গায় যাওয়া কি ভালো হবে?"

আমি তাকে জানালাম যে আমি শুধু একবার দেখতে চাই সে সব জায়গা নিয়ে নানারকম গল্প শোনা যায় সে সব জায়গায় আবহাওয়া এবং পরিবেশ কি রকম।

"লেকের ওপারে চন্দনা পার্ক অঞ্চলটা চেনেন?" সে জিজ্ঞেস করলো।

আমি জানালাম যে, ''হ্যাঁ, আমি চিনি তবে যাইনি কোনোদিন।"

সে বললো, "চন্দনা পার্কে দুদিক থেকে ঢোকা যায়। সাধারণত লোকে যেদিক দিয়ে ঢোকে সেটি হোলো সুধাংশু মিত্তির রোড, যেটা গড়িয়াহাট রোড থেকে বেরিয়ে চন্দনা পার্ক অঞ্চলে গিয়ে পড়েছে।"

"চন্দনা পার্ক তো খুব অভিজাত পাড়া", আমি বললাম।

"আমি চন্দনা পার্কেব কথা বলছি না। শুনুন। চন্দনা পার্কে ঢুকবাব আবেকটি বাস্তা অাছে। সেটি এসেছে প্রিন্সেস বোড থেকে। সরু আকাবাঁকা গলি, নাম গোলাম হোসেন লেন। প্রিন্সেস বোড খুব নির্জন বাস্তা। লোকজন বেশী দেখা যায না। আজকাল একটি বাসরুট হযেছে সেদিকে। তবে গোলাম হোসেন লেন আবো বেশী নির্জন। এ বাস্তায় কোনো বাডিব সদব দবজা নেই। আছে শুধু অসংখ্য বড বড গাছ আব কযেকটি বাগানবাডির পেছনদিকের উঁচু পাঁচিল। বাত্তিবে তো নযই, দিনেব বেলাও কেউ উপর দিয়ে একা যেতে সাহস কবে না।"

স্থিব কবলাম আমি সেদিন বাত্তিবেই যাবো। একবাব ভাবলাম বাত্তিবে ও পথে আমাব একলা যাওযা ঠিক হবে কিনা, কারণ, আব কিছু না হোক গুণ্ডা-বদমাযেসেব পাল্লায় পডাও তো অসম্ভব নয়। তাবপব ভাবলাম, না, কি আব হবে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে ওবকম সামান্য ঝুঁকি অল্পবিস্তব নিতে হয়।

রাত তখন সাডে দশটা। প্রিন্সেস বোডেব মোডে বাস থেকে নেমে বেশ খানিকটা হেঁটে যেতে হোলো। এরই মধ্যে নির্জন থমথমে হয়ে এসেছে চাবদিক। আশেপাশেব বেশীব ভাগ বাডিই অন্ধকার। দূব থেকে বেডিওব গান ভেসে আসছে। অত্যন্ত স্পীডে দু-তিনটা গাডি চলে গেল পাশ কাটিয়ে। আকাশে একটি চাঁদ, দু-চারটে তাবা, আব কখনো সখনো দুটো একটি বাদুড় চামচিকে। ডাস্টবিনের আড়াল থেকে একটি কুকুর মুখ বার করে

ঘেউ ঘেউ করে উঠলো। দু-চারজন পথিক পাশ দিয়ে হেঁটে চলে গেল হনহন করে।

অনেকটা হেঁটে এসে দেখি একটি পানের দোকানে দু'চার জন লোক দাঁড়িয়ে জটলা করছে। তাদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "গোলাম হোসেন লেনটা কোন দিকে পড়বে ?"

ওরা সবাই কথা বন্ধ করে আমার দিকে তাকালো। তারপর একজন জিজ্ঞেস করলো, "ওদিকে আপনি কেন যাচ্ছেন এত রাত্তিরে ?"

"চন্দনা পার্কে যেতে হলে তো ওদিক দিয়েই যেতে হয় জানি," আমি উত্তর দিলাম।

ওরা তাকিয়ে দেখলো আমায়। একজন বললে, "রাত্তিরে ওদিক দিয়ে না যাওয়াই ভালো। লোকে ভয়টয় পায়।"

"আমি ভয় পাই না," আমি বললাম তাদের।

তখন একজন বললে, "আরেকটু এগিয়ে যান। বাঁয়ে প্রথম যে গলিটি পড়বে সেইটিই গোলাম হোসেন লেন।"

আমি এগিয়ে চললাম। পেছন ফিরে না তাকিয়েও বুঝতে পারলাম ওরা চুপচাপ আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

বেশ খানিকটা এগিয়ে যেতে হোলো। তারপর দেখি একটি বড় বাগান বাড়ীর পাঁচিল ঘেঁসে একটি সরু লেন বেরিয়েছে বড় রাস্তা থেকে। মোড়ের গাছতলায় বসে একটি লোক বিড়ি ফুঁকছিলো। তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "এটাই কি গোলাম হোসেন লেন ?"

সে বললে, "হ্যাঁ! কেন ?"

"চন্দনা পার্কে যেতে হলে তো এদিক দিয়েই যেতে হয়," আমি জিজ্ঞেস করলাম।

সে ঘাড় নাড়লো।

আমি এগিয়ে যাচ্ছিলাম। সে হঠাৎ ডাকলো পেছন থেকে, "বাবুজী শুনুন—"

ফিরে দেখি সে উঠে দাঁড়িয়েছে, অত্যন্ত রোগা, লম্বা, লুঙ্গি পরা এক নিম্ন শ্রেণীর লোক। বিড়ির ধোঁয়া ছেড়ে জিজ্ঞেস করলো, "বাবুজী, আপনি এ রাস্তা দিয়ে কোথায় যাচ্ছেন?"

"কেন?" আমি পাল্টা প্রশ্ন করলাম তাকে।

"যাবেন না বাবুজী," সে বললো, "ভয়-টয় পাবেন। লোকের মুখে নানারকম কথা শোনা যায়।"

আমি হেসে উত্তর দিলাম, "ভয় যাদের পাবার তারা পায়। আমি ভয় পাইনে।"

সে একটু তাকিয়ে দেখলো আমায়। এক মুখ বিড়ির ধোঁয়া ছাড়লো। তারপর বললো, "সে কথা তো সবাই বলে বাবুজী, কিন্তু—।"

আমি ওর কথার কোনো উত্তর দিলাম না। এগিয়ে চললাম। গলির ভেতর ঢুকে ফিরে তাকিয়ে দেখি লোকটা আবার বসে পড়েছে। বিড়ির আগুনের ফুলকি দেখা যাচ্ছে গাছ তলার আবছায়ায়।

এগিয়ে চললাম। সরু গলি। ডাইনে উঁচু পাঁচিল, বাঁয়ে উঁচু পাঁচিল। আর বড় বড় গাছ। মাঝে মাঝে একটি দুটি গ্যাসের আলো টিমটিম করছে। তাতে যেন আরো থমথমে হয়ে উঠেছে রাস্তার অন্ধকার। খানিকটা এগিয়ে সরু গলি বাঁয়ে ঘুরে গেল, তারপর খানিকটা এগিয়ে আবার বাঁয়ে ঘুরে গেল। রাস্তার একপাশে একটি বেড়াল বসেছিলো চুপ করে। পায়ের সাড়া পেয়ে দৌড় মারলো।

নিজেই যেন ভয় পেতে সুরু করছিলাম একটু একটু করে। নিজের এই অকারণ ভয়ে নিজেরই হাসি পেলো। হঠাৎ কি জানি কেন খুব জোরে হেসে উঠলাম। আর চারদিকে অট্টহাসির প্রতিধ্বনি উঠলো। সেই প্রতিধ্বনি শুনে বুক কেঁপে উঠলো। তারপর সামলে নিলাম নিজেকে। আরে, এতো আমারই হাসির প্রতিধ্বনি। কিন্তু আমার হাসিই যে এত ভয়াবহ শোনাবে, কে জানতো। হয়তো বা দূরে কোথাও কোনো বাড়ির ভীতু মেয়ে এ হাসি শুনে এরই মধ্যে লেপের

তলায় সেঁধিয়েছে।—আরো যেন নিস্তব্ধ মনে হোলো চারদিক। শুধু পায়ের জুতোর শব্দ। কখন যেন মনে হোলো চলার সাড়া শুধু আমার একলার পায়ের নয়। আরো কে একজন যেন হেঁটে আসছে। আমি থামতে সে আওয়াজও থামলো। ভাবলাম বদলোক কেউ নয় তো! সরে দাঁড়ালাম একটি গাছের ছায়ার আড়ালে। দাঁড়িয়ে রইলাম মিনিট তিন-চার। কারো দেখা নেই। আমি এগিয়ে চলতে আবার মনে হোলো কে যেন পিছু নিয়েছে। কে আসছে পেছন পেছন? ঘুরে দাঁড়িয়ে এবার উল্টোদিকে হেঁটে চললাম। মিনিট কয়েকের মধ্যে আবার বড়ো রাস্তার কাছাকাছি এসে পড়লাম। দেখি, সেই পশ্চিমা লোকটি তখনো গাছ তলায় বসে বিড়ি ফুঁকছে। তাকে জিজ্ঞেস করলাম,—"আমি গলির ভেতর ঢুকবার পর আর কেউ কি ঢুকেছিলো?"

সে অবাক হয়ে তাকালো আমার দিকে। বললো,—"না তো! কেন বাবুজী? ভয়-টয় কিছু পেয়েছেন?"

আমি কোনো উত্তর না দিয়ে আবার ফিরে চললাম গোলাম হোসেন লেন ধরে। অনেকক্ষণ হেঁটে গিয়ে যেখান থেকে ফিরেছিলাম সেখানে পৌঁছুতেই মনে হোলো কে যেন আবার পিছু নিয়েছে। ভাবলাম, সত্যি সত্যি না কি মনের ভুল, যাচাই করে দেখা যাক। নানারকম ভাবে হেঁটে, কখনো আস্তে কখনো জোরে কখনো দাঁড়িয়ে পড়ে কখনো দৌড়ে দেখি, অন্য পায়ের আওয়াজটিও ঠিক আমারই মতো কখনো আস্তে হাঁটছে, কখনো জোরে কখনো বা দাঁড়িয়ে পড়ছে কখনো দৌড়াচ্ছে আমাবই সঙ্গে সঙ্গে। আমার হাসি পেলো। একি ছেলেমানুষি করছি আমি? এতো আমারই পদশব্দের প্রতিধ্বনি। আমার সামনে পেছনে কেউই নেই। অন্য পায়ের শব্দ আসবে কোত্থেকে। নিজের অজান্তে হঠাৎ আবার জোবে হেসে উঠলাম। হেসে উঠেই থেমে গেলাম। কী সাংঘাতিক ভয়াবহ প্রতিধ্বনি! থামতেই যেন চায় না। ভয় পেয়ে উড়ে গেল এক ঝাঁক চামচিকে। আবার চারদিক নিস্তব্ধ,

বড়ো বেশি নিস্তব্ধ। সামনে আরো বেশি ঘন অন্ধকার। কি যেন নড়ছে সেখানে। ভালো করে তাকিয়ে দেখি কে যেন নিস্পন্দ হয়ে শুয়ে পড়ে আছে সেখানে।

কে?—আমি হাঁক দিলাম। কই, কেউ না তো। মনের ভুল। কিন্তু এরকম মনের ভুল হবে কেন? হঠাৎ মনে পড়লো দাঙ্গার সময় একদিন সন্ধ্যেবেলা এক নিরালা পথের পাশে ও-রকম ভাবে একজনকে পড়ে থাকতে দেখেছিলাম। সেই ছবি মনের অবচেতন থেকে বেরিয়ে এসে এই পরিবেশে একটা মনেব ভুল সৃষ্টি করেছে।

হাসলাম নিজের মনে, তবু আরেকবার হাঁক দিলাম,—কে ওখানে?—কোনো সাড়া এলো না। আমার প্রতিধ্বনিরও নয়। খেয়াল হতে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। পায়ের শব্দের প্রতিধ্বনি শুনেছি, হাসিব প্রতিধ্বনি শুনেছি, কিন্তু আমার কথার প্রতিধ্বনি নেই কেন? সাহসে বুক বেঁধে হাঁটতে স্রুক করলাম। আমার কাছে ফিরে এলো পদশব্দেব প্রতিধ্বনি। আমি থামতে সেটিও থামলো।

আবার যাচাই কবতে হাঁক দিলাম, - কে ওখানে?

কোনো সাড়া নেই, কোনো প্রতিধ্বনি নেই।

বাঃ বেশ মজাব ব্যাপার তো। হাসি পেলো, নিজেকে রুখতে পারলাম না। জোবে জোবে হেসে উঠলাম। একশো গুণ তীব্র হয়ে ফিবে এলো গায়ে-কাঁটা-দেওয়া প্রতিধ্বনি। আমাব হাসি বন্ধ হোলো কিন্তু সেই হাসি যেন আর থামলো না, সে বেড়ে চলেছে তো বেড়েই চলেছে। সব কিছু দুলতে লাগলো আমাব চারদিকে। কখন দেখি আমি দৌড়াচ্ছি, প্রাণপণে দৌড়াচ্ছি। রেলগাড়িব পাশ কাটিয়ে যেমনি ছুটে যায় গাছপালা বাড়িঘব মাঠ-জঙ্গল স্টেশন সব কিছু, তেমনি আমার পাশ কাটিয়ে ডাইনে বাঁয়ে ছুটে চলে গেল বাড়ির পাঁচিল, গাছ, ল্যাম্প-পোস্ট, সব কিছুর সব দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর ছায়া। কিন্তু পথ আর ফুরোতে চায় না। কতো দীর্ঘ এই গোলাম হোসেন লেন? শুনেছিলাম,

চার পাঁচশো গজের বেশি নয়, কিন্তু এতক্ষণ হেঁটে এলাম, ছুটে এলাম, তবু পথ আর ফুরোয় না কেন? অত্যন্ত পরিশ্রান্ত মনে হোলো নিজেকে, কিন্তু থামতে পারলাম না কিছুতেই। খুব দূর থেকে ভেসে এলো রেডিওর গান। মনে হোলো হয়তো বা এসে পড়েছি চন্দনা পার্কের কাছাকাছি।

দাঁড়িয়ে পড়লাম। সত্যি, কী ভয়টাই না পেয়েছিলাম ছেলে-মানুষের মতো। নিজেব মনে হাসলাম একটুখানি। রুমাল বার করে মুখ মুছে নিলাম। তাবপর মুখ তুলে দেখি সামনে দাঁড়িয়ে আছে একজন।

"কে?"—আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"আমি, বাবুজী।"

দেখি, গাছ তলায় বসে যে বিড়ি ফুঁকছিলো, সেই লোকটা।

আমি অবাক। সে আমার সামনে এসে পড়লো কি করে? আমার পেছন পেছন তো কেউ আসে নি।

তখনো বিড়ি ফুঁকছিলো সে। চাঁদের আবছা আলোয় সেই থমথমে আবহাওয়ায় আর দীর্ঘ মনে হোলো তাকে। দূর থেকে রেডিওর গান ভেসে এলো।

ভারী গলায় লোকটি আস্তে আস্তে বললো, "তখনই বলেছিলাম, বাবুজী, এ পথ দিয়ে আসবেন না, ভয়টয় পাবেন। এবার বিশ্বাস হোলো তো?" বলে সে হেসে উঠলো। ঠিক সেই ঝড়ের মতো হাসি যাকে আমার নিজের হাসির প্রতিধ্বনি ভেবে ভুল করেছিলাম।

ব্যস, তারপর হঠাৎ ঘোর কালো অন্ধকার নেমে এলো চারিদিকে। আর কিছু আমার মনে নেই।"

প্রতাপ মুখার্জী একটু থামলো।

তারপর বললো, "পরদিন সকালে আমাকে সেখানে বেহুঁশ অবস্থায় খুঁজে পায় কয়েকজন গয়লা। দিন পনেরো হাসপাতালে

কাটিয়ে বাড়ী ফিরেছিলাম।" সবার দিকে চোখ ফিরিয়ে একবার একবার তাকালো তারপর আরও গলা নামি আস্তে আস্তে বললো, "আর সেদিন থেকে আমার ভৌতিক গল্প লেখবার শখ একেবারে মিটে গেছে।"

বনানী মৈত্রের বাড়ীতে বিভিন্ন রোববার সন্ধ্যায় এ পর্যন্ত যতো রকম আজগুবী গল্প শোনা গেছে তাদের মধ্যে প্রেম, ঘৃণা, ঈর্ষা, বেদনায় সব চাইতে বেশী ব্যঞ্জনাময় হোলো অজানা মেয়ের গলির কাহিনী। একে ঠিক রহস্য কাহিনী বলা যায় না কারণ এ গল্পের বিভিন্ন ঘরটার মানবিক আবেগেব সংঘাতের ভূমিকা অনেক বেশী। এই কাহিনীর ভৌতিক উপাদান শুধু এইটুকু যে কেউ না কেউ অবুঝ হোয়ে বিশ্বাস করতো যে, শহরের উপকণ্ঠের সেই নির্জন আঁকা-বাঁকা গলিতে কোনো এক অতৃপ্ত বিদেহী আত্মা নিঃসঙ্গ হয়ে বিচরণ করতো পথভ্রান্ত পথিকেব প্রত্যাশায়। তাই থেকে সেই পথের সরকারী নাম সবাই ভুলে গিয়ে তার নাম হয়েছিলো—অজানা মেয়ের গলি।

একদিন রোববার সন্ধ্যায় এ গল্প সবাই শুনলো পুলিসের এ্যাসিস্ট্যাণ্ট কমিশনার পূর্ণাংশু গুহের কাছে।

"আমি তখন শহরতলির কোনো একটি থানার ও-সি—বলতে সুরু করলো পূর্ণাংশু গুহ।—সে অনেক বছর আগেকাব কথা। ওই অজানা মেয়ের গলি সেই থানারই এলাকায় পড়ে। ওপথ দিয়ে বেশী রাতে কেউ যেতো না, বিশেষ করে চাঁদনি রাতে যখন গলির শেষ প্রান্তের জলা মাঠের ধারে ধারে তাল আর নারকোল গাছের মাথা পেরিয়ে চাঁদ উঠে আসতো। জংলা পথ, পথের দুপাশে মাঝে মাঝে জীর্ণ খোলার বাড়ী, দুটো তিনটে পোড়ো বাগানবাড়ি

কেউ থাকতো না এখানে। শুধু দু চার জন অতি দীন দরিদ্র বা সমাজ বিহীন অপরাধী শ্রেণীর লোকজন দেখা যেতো মাঝে মাঝে, ওরাও ডেরা বাঁধতো বড়ো রাস্তার কাছাকাছি খোলার ঘরগুলোতে। ওরা কেউ বেশী রাত অবধি বাইরে থাকতো না, বাড়ী ফিরতো বেশী রাত হওয়ার আগেই। চাঁদ যখন একটু একটু উঁকি মারতো পিপুল আর নারকোল গাছের অশান্ত পাতাগুলোর ফাঁকে ফাঁকে, একটি জানলাও কোথাও খোলা দেখা যেতো না, নিস্তব্ধ পথে শোনা যেতো না কারো পায়েব সাড়া।

পথের আওয়ারা কুকুরগুলোও যেন করুণ ডাক ডেকে সরে যেতো সেখান থেকে। শুধু মাঝে মাঝে আবছাওয়ার অন্ধকারে ঝোপের পাশে পোড়ো কুঁড়ে ঘবের দাওয়ায় শোনা যেতো বেড়াল ডাকছে বাচ্চা ছেলেব কান্নাব মতো। আর কোনো সাড়া শব্দ নেই, ববফের মতো জমে যাওয়া চাঁদের আলোয় ভয়াবহ স্তব্ধতায় ঘুমিয়ে থাকতো নিশ্চল নিথর ছায়ায় ছায়ায় ছায়াঘন আঁকাবাঁকা অজানা মেয়ের গলি।

যে কোনো রকম দুষ্কায বা অপবাধ কববাব জন্যে এটা ছিলো আদর্শ জাযগা, কিন্তু কিছুই কোনোদিন হোতো না। লোকে বলতো একটি আশ্চয সুন্দর মেয়ের প্রেত সে পথে টহল দিতো সারা রাত আব কেউ একবার তার সামনে পড়লে তার কথা বলবার জন্যে ফিরতে পারতো না। প্রথম ঘটনাটা ঘটে কয়েকবছর আগে। দুই বন্ধু এ পথ দিয়ে যাচ্ছিলো। তার পবদিন একজনকে দেখা গেল মরে পড়ে আছে জলামাঠের মধ্যিখানে, অন্যজনকে দেখা গেল ঘোর উন্মাদ হয়ে ছুটোছুটি কবে বেড়াচ্ছে তিন মাইল দূরে অন্য এক জায়গায়। শুধু বিড়বিড় করে বলছে এক সুন্দরী মেয়ের কথা। তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হোলো পাগলা গারদে। পুলিস থেকে তদন্ত সুরু হোলো। একদিন সকালবেলা এক পুলিসকে অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া গেল জলামাঠের কাছে। হাসপাতালে জ্ঞান ফিরে আসতে

সে এলোমেলো ভাবে এক সুন্দরী মেয়ের রূপ বর্ণনা করতে করতে হঠাৎ খাবি খেয়ে ইহলীলা সংবরণ করলো। বছরখানেকের মধ্যে আরো কয়েকজনের নিষ্প্রাণ দেহ পাওয়া গেল, যারা না জেনে ঢুকে পড়েছিলো ওই রাস্তায়। ব্যস, তারপর থেকে রাত হলে কেউ আর ওপথে যেতো না। পুলিসও নয়।

"আমি যখন ও-অঞ্চলের থানার চার্জ নিলাম"—পূর্ণাংশু গুহ বলে গেল—"এই রাস্তার গল্প শুনলাম অনেকের কাছেই। যাই হোক ইদানিং যখন ওখানে কোনো ঘটনা আর ঘটেনি আমরা কেউ আর মাথা ঘামাতাম না।

যাই হোক একদিন আমার এক পিসতুতো ভাই আমার কোয়ার্টারে অতিথি হয়ে এলো। তার নাম সরিৎ দত্ত। কোথায় যেন একটা ভালো চাকরি করে। কিন্তু বিয়ে থা করেনি। পিসীমা তার জন্যে পাত্রী পছন্দ করেছিলেন। কিন্তু সে রাজী নয়। পিসীমা আমায় চিঠি লিখেছিলেন যদি বলে কয়ে সরিৎকে রাজী করাতে পারি। রাত্তিরে খাওয়া দাওয়ার পর কথাটা পাড়লাম।

"অবনী বোসের মেয়েকে বিয়ে করবো আমি?" সরিৎ হাত নেড়ে বললো, "আমার কি মাথা খারাপ হয়েছে নাকি?" এই বলে চিরকালের অনিচ্ছুক অবিবাহিতদের মতো তার আদর্শ নারীর বর্ণনা দিলো।

আমি হেসে বললাম, "ওরকম একজন আমার সন্ধানে আছে! কিন্তু লোকে তার কাছে ঘেঁষতে সাহস পায় না।"

"কেন?" সে জিজ্ঞেস করলো।

"কারণ লোকে বলে সে নাকি মানুষ নয়, ভূত," আমি উত্তর দিলাম।

শুনে খুব হাসলো শ্রীমান সরিৎ। জানতে চাইলো ব্যাপারটা কি। আমি ওকে শোনালাম অজানা-মেয়ের গলির কাহিনী। গল্প শুনে সে আস্তে আস্তে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লো।

আমি বললাম, "যাই হোক, আমায় বলো কি করবো। আমি কি পিসীমাকে লিখবো যে তুমি অবনী বোসের মেয়েকে বিয়ে করতে রাজী আছো ?"

সরিৎ চাদর সরিয়ে মুখ বার করলো। জিজ্ঞেস করলো, "তুমি কি বলছিলে ? লোকে বলে সে মানুষ নয়, ভূত ?"

"কে ? অবনী বোসের মেয়ে ?" আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

"না, সেই অজানা মেয়ের গলির রহস্যময়ী" সে উত্তর দিলো।

"ও চুলোয় যাক," আমি বললাম, "তুমি বলো, তুমি অবনী বোসের মেয়েকে বিয়ে করতে রাজী আছো কিনা ?"

"আমার বড্ডো ঘুম পাচ্ছে" বলে সরিৎ চাদরে মুখ ঢেকে ঘুমিয়ে পড়লো।

বেশ হাওয়া-ঝিরঝির রাত। বেশ ঘুমোচ্ছিলাম। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। টেবিল-ঘড়ির রেডিয়াম ডায়ালে দেখি দুটো প্রায় বাজে। পাশ ফিরে দেখি সরিৎ বিছানায় নেই। বোধহয় বাথরুমে গেছে—ভেবে ঘুমিয়ে পড়লাম। আরেকবার ঘুম ভাঙলো। তখন সাড়ে তিনটে। দেখি, সরিৎ তখনো বিছানায় নেই। উঠে বসলাম বিছানার উপর। কই, বাথরুমে তো আলো নেই। বাথরুমের দরজা খোলা। উঠে বাইরে বেরিয়ে এলাম। সরিৎ সেখানেও নেই। তখন ঘরে ঢুকে লক্ষ্য করলাম যে সরিতের জামা-জুতোও নেই। সিঁড়ির দরজা খোলা। বাইরে ফটকের কাছে একজন পুলিস বসে থাকতো। তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে বললো, সরিৎ অনেকক্ষণ আগে বেরিয়ে গেছে, বলে গেছে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরে আসবে।

শুনে খুব রাগ হোলো। সরিৎ ছেলেবেলা থেকেই একটু ডানপিটে। আমার কাছে গল্প শুনে এখন বেড়াতে গেছে সেই নির্জন রাস্তায়। কিন্তু যদি চোর বদমাসের হাতে পড়ে তাহলে ?

আমিও তাড়াতাড়ি পথে নেমে এলাম। বেশী দূরে যেতে হলো

না। দেখি সরিৎ ফিরে আসছে। তার চুল হাওয়ায় এলোমেলো। চাঁদের আলোয় অত্যন্ত ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে তার মুখখানা।

"কোথায় গিয়েছিলে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"অজানা মেয়ের গলিতে," সে উত্তর দিল, "বেড়ানোর জন্যে সে অপূর্ব জায়গা।"

বাড়ি ফিরে আবার শুয়ে পড়লাম। আমি বললাম "এত রাত্তিরে না গেলেই চলতো। ওসব জায়গায় চোর ডাকাত গুণ্ডা থাকতে পারে তো! কিন্তু তোমায় এত ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে কেন? ভয় টয় পেয়েছিলে নাকি?"

"নাঃ, ভয় পেতে যাবো কেন," খুব জোরে হেসে উঠে সরিৎ বললো, "বরং খুব ভালো লেগেছে। চাঁদের আলোয় ওই জায়গাটা খুব সুন্দর দেখায়, বিশেষ করে পথ শেষ হয়ে যেখানে জলা মাঠ সুরু হয়েছে।"

কিন্তু ও যেভাবে বললো তাতে আমার একটু খটকা লাগলো। কিছু যেন গোপন করতে চাইছে সে। যাই হোক, ঘুম পাচ্ছিলো বড্ডো। তাই আর কিছু না বলে ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন রাত্তিবে এক সময় ঘুম ভাঙতে দেখি সরিৎ তার বিছানায় নেই। হঠাৎ আমার মনে পড়লো যে সাবাদিন সরিৎকে খানিকটা চঞ্চল ও অস্থির মনে হয়েছিলো। ঘড়িতে দেখলাম ভোর প্রায় সাড়ে চারটে। তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম।

কিন্তু সরিতের খোঁজে বেরিয়ে পড়বার আগেই যে ফিরে এলো।

"আবার কেন গিয়েছিলো সেখানে," আমি রাগ কবে জিজ্ঞেস করলাম।

"চাঁদের আলোয় বেড়ানোর মতো জায়গা," সে উত্তব দিলো, "আমার খুব ভালো লাগে।"

আমি আর কিছু জিজ্ঞেস করলাম না, কিন্তু ও যেভাবে বললো সেটা আমার ভালো লাগলো না।

পরদিন সন্ধ্যেবেলা ওকে বললাম, "আজ তোমার সঙ্গে আমিও যাবো।" কিন্তু যখন আমার ঘুম ভাঙলো তখন ভোর হয়ে এসেছে। উঠে পড়ে দেখি সরিৎ ফিরে এসে প্যান্ট ছেড়ে পায়জামা পরছে।

"যাবার সময় আমায় ডাকো নি কেন," ওকে জিজ্ঞেস করলাম।

সে উত্তর দিলো, "তোমায় দরকার হবে না বলে।"

মনে হোলো ওকে আগের চাইতে অনেক বেশি ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে।

তারপর দিন ভেবেছিলাম জেগেই থাকবো যাতে আমায় এড়িয়ে সরিৎ বোরোতে না পারে। কখন ঘুম পেয়ে গেল খেয়াল নেই। একটা অসহ্য দুঃস্বপ্নের মধ্যে ঘুম ভাঙলো রাত দুটো নাগাদ। প্রত্যেক দিনকার মতোই সরিতের বিছানা এমনি পড়ে আছে। সরিৎ নেই।

চুলোয় যাক,—ভেবে আমি ঘুমিয়ে পড়বার চেষ্টা করলাম, কিন্তু ঘুম এলো না। পাশ ফিরতে আরেকবার সরিতের বিছানার উপর চোখ পড়লো। হঠাৎ নজরে পড়লো কালো কি একটা পড়ে আছে বিছানার উপর, নজর করে দেখি, একটি ডায়ারি। কিন্তু ওখানে ডায়ারি কেন? ভালো করে তাকিয়ে দেখি ডায়ারির নিচে একটি চিঠি চাপা দেওয়া আছে।

ধড়মড় করে উঠে পড়ে চিঠি খুলে দেখি লেখা আছে,—পূর্ণাংশু আমি বোধহয় আর ফিরে আসবো না। ওকে নিয়ে আমি পালিয়ে যাচ্ছি। তুমি আমায় না জানালে ওর সঙ্গে আমার পরিচয় হোতো না কোনোদিন। আমি তার জন্যে তোমার কাছে খুব কৃতজ্ঞ। বেশি কিছু লিখবার সময় নেই। আমার ডায়ারির শেষ কয়েক পাতা পড়লেই সব বুঝতে পারবে।

ডায়েরী উল্টে পড়ে গেলাম। তাতে লেখা আছে ঃ

রোববার, ১৪ই—পূর্ণাংশু বললে অজানা মেয়ের গলিতে একটি সুন্দর মেয়ে ঘুরে বেড়ায়। সবাই মনে করে সে একটা প্রেতাত্মা। আমি লুকিয়ে দেখতে গেলাম। দেখলাম। আলাপ হোলো। ভূত টুত সব বাজে কথা। ঠিক আমাদেরই মতো রক্ত মাংসের মানুষ।

খুব সুন্দর। বর্ণনা করা আমার ভাষায় কুলোবে না। পথের শেষ মাথায় একটি ঘরের দাওয়ায় বসে কাঁদছিলো। গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কী ব্যাপার। বললে, তার স্বামী মদ খেয়ে মাতাল হয়ে তাকে মেরেছে, মেরে ঘরের বার করে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। প্রত্যেকদিন নাকি এমনি হয়। জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম। ওর স্বামী বুড়ো কিন্তু বেশ শক্ত দেখতে, দিশী মদ খাচ্ছে ঘরের ভিতর বসে। তাকে ডাকলাম, দরজায় ধাক্কা দিলাম। সে সাড়া দিলো না। অনেকক্ষণ সেই মেয়েটির কাছে বসে রইলাম। ওকে কি করে ওই অবস্থায় একলা ছেড়ে আসি? ভোর চারটের সময় ওর স্বামী এসে দরজা খুলে দিলো। ও আমায় তাড়াতাড়ি চলে যেতে বললো, যাতে ওর স্বামী দেখতে না পায়। আমায় দেখতে পেলে নাকি ওকে আরও মারধোর করতে পারে। আমি চলে এলাম।

সোমবার, ১৫ই—সারাদিন ওর কথা মনে পড়ছিলো। রাত্তিরে আবার না গিয়ে পারলাম না। সেখানে বসে সেদিনও কাঁদছিলো। হাতে মারধোরের কালচে দাগ। অনেকক্ষণ বসলাম। অনেক কথা বললো। ওর জীবনে অনেক দুঃখ। আমার খুব কষ্ট হোলো। কিন্তু কী করতে পারি। আহা বেচারী! লোকে আবার ওকে ভূত ভেবে ভয় পেতো, এমন ভীতু সবাই। লোকে এমন গাধা হতে পারে মাঝে মাঝে, সত্যি!

মঙ্গলবার, ১৬ই—সারাদিন আমার মন আর বিবেকের মধ্যে লড়াই। শেষ পর্যন্ত স্থির করে ফেললাম। এ-রকম জীবনে বোধ হয় হয় না, কিন্তু যখন হয় এরকম ভাবেই হয়। তাকে বললাম। সে অনেক ভাবলো। তারপর রাজী হোলো। বেচারী জীবনে কোনোদিন সুখের মুখ দেখেনি। এমন সময় একটা বিচ্ছিরী ব্যাপার ঘটলো। ওর স্বামী হঠাৎ বাইরে বেরিয়ে এলো। আমার সঙ্গে ওকে দেখে গালাগাল দিয়ে ওর চুল ধরে ওকে ঘরের ভিতর টেনে নিয়ে গেল।

যেতে যেতে আমায় বলে গেল, যদি আমায় আর কোনদিন ওখানে দেখে তো আমায় জানে মেরে দেবে। আমি শুধু ওই মেয়েটির কথা ভেবেই চুপ করে রইলাম। তা নইলে ওকে একবার দেখে নিতাম।

বুধবার, ১৭ই—মন স্থির করলাম। আজই ওকে নিয়ে চলে যাবো। দুপুরে গিয়েছিলাম। ওর স্বামী বাড়িতে ছিলো না। সে একা ছিলো। তখন চলে আসছিলো আমার সঙ্গে। এমন সময় পথের বাঁকে ওর স্বামীকে দেখে আমায় পালিয়ে আসতে হোলো। সে বললো, রাত দুপুরে পিপুল গাছের নিচে আমার জন্যে অপেক্ষা করবে। ব্যাঙ্কে গেলাম। টাকা তুললাম। আজ আমার জীবনে এমন একটি রাত আসবে যা আমি হয়তো কোনো দিনই ভুলবো না।

ডায়ারির লেখা এই পর্যন্ত।—আমি আর অপেক্ষা করলাম না। নিচে নেমে থানা থেকে একজন এস-আই আর দুজন কনেস্টবল সঙ্গে নিয়ে তক্ষুনি ছুটলাম সেই অঞ্চলের দিকে। তখন বারোটা বেজে কুড়ি। রূপোলী-পাড় কালো মেঘের পেছনে চাঁদ ঢাকা পড়েছে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় মরমর করছে ঘুমন্ত গাছের পাতা। পথের ভিতর ঢুকতে পুলিস দুজন ইতস্তত করলো। কিন্তু এলো আমার পেছনে পেছনে। সারা পথে আলোর ছায়ায় ঝরোকার মতো প্যাটার্ন আঁকা। আশে পাশের দু-চারটা বাড়ি যাও বা আছে, তাদের জানলা সব বন্ধ। কোথাও একটুকু শব্দ নেই।

কিন্তু সরিৎ কোথায়?—আমি ভাবলাম।

হঠাৎ তাকে দেখতে পেলাম।

দেখতে পেলাম পথের একটা বাঁকে পৌঁছুতেই। পথের শেষে যেখান থেকে জলা-মাঠ সুরু হয়েছে, সেখানে একটি বড়ো পিপুল গাছ। তারই নিচে সরিৎ একা চাঁদের আলোয় ছায়া ছবির মতো দাঁড়িয়ে। একা, কেউ নেউ সঙ্গে।

পথের বাঁক থেকে সে জায়গাটা প্রায় একশো গজ দূরে। আমি তাকে ডাকতে যাচ্ছি, এমন সময় দেখলাম অন্য পাশে ছায়ার আড়াল

থেকে আরেকজন আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলো। তার হাতে কি একটা যেন চাঁদের আলোয় ঝিকমিক করে উঠলো। দেখে আমার গায়ের রক্ত জল হয়ে গেল। সরিৎ তাকে দেখতে পায়নি। সে সরিতের পেছনে। আমি চিৎকার করে ডাকলাম সরিৎকে। কিন্তু সরিৎ ঘুরে দাঁড়ানোর আগেই সে লোকটি ছোরা বসিয়ে দিলো।

বুড়ো লোকটা আর পালিয়ে যেতে পারেনি আমরা তাকে ধরে ফেললাম। কিন্তু সরিৎ আর চোখ খুললো না। শেষ নিশ্বাস নিলো সেখানেই।

"স্ত্রীলোকটি কোথায়," আমি চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলাম। এস আই'কে বললাম, "তাকে খুঁজে বার করো।"

"তাকে তোমরা কেউ খুঁজে পাবে না," পাগলের মতো হেসে বললো সেই বুড়ো। আব কিছু বললো না।

তাকে থানায় এনে পুরোনো রেকর্ড খুঁজে পেতে কিছু জানা গেল তার সম্বন্ধে। অনেক বছর আগে এ লোকটি তার সুন্দরী বৌকে খুন করেছিলো এই সন্দেহ করে যে সে তাকে লুকিয়ে অন্য কারো সঙ্গে প্রেম করছে। তবে ঠিকমতো প্রমাণ ছিলো না বলে অনেক দিন মামলা চলার পর হাইকোর্টের আপীলে তার শুধু সাত বছর জেল হয়েছিলো। সেও অনেকদিন আগেকার কথা। তখন তার কাঁচা বয়েস। এখন বুড়ো হয়ে গেছে। তবু তার মনের সন্দেহ, ঈর্ষা, বিদ্বেষ কিছুই মুছে যায়নি। মাথারও যেন গোলমাল হয়ে গেছে।

"আমিই সব্বাইকে খুন করেছি," সে বললো, "যারাই অনেক রাত্তিরে এসে আমার বাড়ির কাছে ঘোরাঘুরি করতো, তাদের সব্বাইকে আমিই মেরেছি। আমি জানতাম যে ওরা সবাই আমার বৌয়ের পেছনে ঘুরছে। ও মরে ভূত হয়ে গেলেও কি হবে, তবু তার পেছনে ঘুরছে। ও আমার বৌ। জান্ত হোক, ভূত হোক, যাই হোক, তবু আমার বৌ। ওসব আমি সহ্য করবো না।"

যাই হোক, ওকে তো দায়রায় সোপর্দ করা হোলো।

ইতিমধ্যে একদিন রাত্তিরে একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটলো। সেই রাস্তায় সেদিন যে-পুলিসের ডিউটি ছিলো সে ছুটতে ছুটতে হাঁফাতে হাঁফাতে থানায় চলে এলো।

কিছুক্ষণ সে কোনো কথাই বলতে পারলো না। তারপর যখন সম্বিত ফিরে এলো, তখন একটা আশ্চর্য ঘটনা শোনালো।

সেই বুড়োর কুঁড়ে ঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ তার মনে হোলো কেউ যেন ঘরের ভিতর কথা বলছে। কিন্তু দরজায় তালা। তার সন্দেহ হোলো। জানলা দিয়ে উঁকি মেরে কিন্তু ঘরের ভিতর কাউকে দেখতে পেলো না।

সে যখন চলে আসছিলো তখন আবার গলার আওয়াজ পেলো, খুব নবম গলার আওয়াজ, কিন্তু খুব পরিষ্কার। এবার কিন্তু সে আর জানলা দিয়ে উঁকি মারলো না, জানলার একপাশে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনলো।

একটি পুরুষের গলা। সে বললো, "তুমি কি তৈরী? আমাদের হাতে বেশী সময় নেই কিন্তু।"

অন্যটি মেয়ের গলা। সে উত্তর দিলো, "হ্যাঁ আমি তৈরী। চলো। কিন্তু একটা কথা, তুমি সত্যি সত্যি আমায় কোনোদিন ছেড়ে চলে যাবে না তো?"

ছেলে বললো, "কোনোদিন না, এ জীবনে না। চলো এবার। আমাদের বহুদূর যেতে হবে।"

তারপর সেই ঘরের অন্ধকার থেকে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে রূপ পরিগ্রহণ করলো। আপনা আপনি খুলে গেল দরজার তালা। ওরা বাইরে বেরিয়ে এলো।

ততক্ষণে কনস্টেবলটির হাঁটু ছুটো ঠকঠক করে কাঁপতে সুরু করছে। কারণ ছেলেটিকে আমার কোয়ার্টারে দেখেছে, তারপর

সেদিন রাত্তিরে পিপুল গাছের নিচে দেখেছে। মেয়েটিকে কিন্তু কোনোদিন দেখেনি,। ভারী সুন্দর নাকি দেখতে, কিন্তু চাঁদের আলোয় খুব ম্লান, খুব বিষণ্ণ দেখাচ্ছিলো তার মুখ।

ওরা হাত ধরাধরি করে পথ পেরিয়ে জলা-মাঠের দিকে চলে গেল, তারপর আর দেখা গেল না তাদের।

কনস্টেবলটির কথা আমরা কেউ বিশ্বাস করিনি, কিন্তু তারপর থেকে আরো অনেকের মুখে শোনা গেছে যে একটি ছেলে ও একটি মেয়েকে রাত তুপুরে তুজন-তুজনার হাত ধরে চলে যেতে দেখা গেছে জলা-মাঠের দিকে।

আর সেদিন থেকে সে পথে কোনোদিন কোনো তুর্ঘটনা হতে শোনা যায়নি, কাউকে ভয় পেতে শোনা যায়নি। তারপর কয়েক বছরের মধ্যে শহব বাড়তে বাড়তে সেখানে পৌঁছে গেছে। নতুন নতুন হালফ্যাশানের বাড়ি উঠেছে। এখন ওখানে অনেক লোক থাকে, ও পথ দিয়ে হেঁটে গেলে শোনা যায় অনেক হাসি-গান, এখন ও পথের বাড়ির জানলায়-জানলায় ঝলমল আলো। সেই সরু গলি আর নেই, ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের কল্যাণে অনেক চওড়া হয়ে গেছে। রাস্তার নতুন নামকরণও হয়েছে, কিন্তু তবু এখনো সবাই জানে ও রাস্তার নাম হোলো অজানা-মেয়ের-গলি।"

পূর্ণাংশু গুহের গল্প শুনে রোববারের আসরের পুরুষ সদস্যেরা। সবাই মুখ টিপে একটু হাসলো। কিন্তু হাসলো না মহিলা সদস্যেরা দেখা গেল, ওরা ভারী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছে একজনের পর একজন।

রোববারের আসরের অন্য সবার কাছে খবরটা প্রথম ভাঙলো বনানীর দিদি মঞ্জু লাহিড়ী, অপূর্ব লাহিড়ির স্ত্রী।

বনানীর সঙ্গে অসিত চ্যাটার্জীর বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে। আগামী বৈশাখে বিয়ে।

খুশী হোলো সবাই কিন্তু বিস্মিত হোলো না। খবরটা এমন কিছু অপ্রত্যাশিত নয়। মাসখানেক ধরে তুজনের মধ্যে যে আস্তে আস্তে যে একটা অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠছে সেটা লক্ষ্য করে ছিলো সবাই। সবাই একটু আড়চোখে বিভূতি দত্তের দিকে তাকালো। বনানীর জন্যে বিভূতির যে একটা তুর্বলতা আছে সেকথা সবাই জানতো। সবাই বোধহয় ভাবছিলো খবরটা বিভূতি কি ভাবে নেবে। দেখা গেল বিভূতির মুখেও খুশির দীপ্তি। সে যেন অন্য সবার চাইতে অনেক বেশী খুশী।

সেদিনকার আসরে আর গল্প বলা হোলো না। সবাই খুব হৈ চৈ হাসি ঠাট্টা গল্প গুজব করলো। মীনা আর কান্তি রায়-চৌধুরী গান গেয়ে শোনালো। প্লেটের পর প্লেট শিঙাড়া আর কচুরি সাবাড় হয়ে গেল।

গল্প গুজবের মাঝখানে কে যেন বললো, 'আজ আর কোনো ভূতের গল্প হোলো না।"

বনানী বললে, "ভূতের গল্প অনেক হয়েছে। আর নয়। এবার যদি গল্প বলতেই হয়, তা হলে অন্য কোনো ধরণের গল্প বলতে হবে।

পরিমল বললো, "আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে। সবাই একটা করে প্রেমের গল্প বলুক। মন গড়া নয়, সত্যি-কারের প্রেমের গল্প। বনানী আর অসিতই প্রথম সুরু করুক।"

বনানীর মুখ একটু লাল হয়ে গেল। সবাই হাসলো। মঞ্জু লাহিড়ী বললো, "না, গল্প আর নয়। এবার যদি কেউ সত্যি সত্যি ভূত এনে আমাদের আসরে দেখাতে পারো তো দেখাক।"

বিভূতি জিজ্ঞেস করলো অসিতকে, "আচ্ছা, আপনি তো সাই-কোলোজীর লোক। সত্যি করে বলুন তো, আপনি ভূত বিশ্বাস করেন?"

"না," অসিত হেসে উত্তর দিলো, "ও সব মন গড়া।"

"কিন্তু মানুষ মন দিয়ে ভূত গড়ে কেন?"

"মন দিয়ে মানুষ অনেক কিছুই গড়ে, "অসিত বললো, "তার জন্যে ভোগে, কষ্ট পায়, আবার আনন্দও পায়, সুখীও হয়। কেন গড়ে সে এক দুরূহ প্রশ্ন। অচেতন মনের কোথায় কখন কি খেলা চলছে, সেটা ভালো করে না বুঝে চট করে কোনো সিদ্ধান্ত করা যায় না। তবে সাধারণভাবে এটুক বলা যায় যে জীবনের এত কিছু অজানা এবং সেজন্যে মানুষের মনে এমন একটা নিরুপায় অনিশ্চয়তার ভীতি যে অলীক কল্পনা দিয়ে তার একটা কারণ সৃষ্টি করে মানুষ তৃপ্তি পায়। মন গড়া ভয় থেকে মানুষ একটা আনন্দও পায়। তাই ভূতের সৃষ্টি। তবে ব্যক্তিবিশেষে অন্য কারণও থাকতে পারে।"

পুলিসের এ-সি পূর্ণাংশু গুহ চুপ করে ছিলো এতক্ষণ। এবার বললো, 'আপনারা ভূত দেখতে চান?"

সবাই উত্তর দিলো, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখতে চাই। কোথায়?"

"সে সত্যি সত্যি ভূত কি না, সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে," বললো পূর্ণাংশু গুহ, "তার যে ধরণের পরিস্থিতিতে এসব আজগুবি গল্পের সৃষ্টি হয়, সে রকম একটা পরিস্থিতি সম্প্রতি দেখা গেছে।"

সবাই উৎসুক হোলো।

"সবাই নিশ্চয়ই খবরের কাগজের হেডিংটা লক্ষ্য করেছেন— রেড রোডের কালো ট্যাক্সি। ভালো হেডিং দিয়েছে বিভূতি বাবুদের কাগজের লোকেরা। অবশ্যি আর কিছুদিন পরে হলে এ নাম দেওয়া চলতো না, কারণ শিগ্‌গিরই একটা নতুন নিয়ম হবে যাতে কলকাতার সব ট্যাক্সিরই একটি সাধারণ রং হয়, ওপরটা সাদা, নিচেরটা কালো। তখন আর এখনকার মনো নানা রঙের ট্যাক্সি আর দেখা যাবে না। সব ট্যাক্সিই হবে দেখতে একই রকম। কিন্তু এখন

পর্যন্ত লাল, কালো, হলদে নানা রকম ট্যাক্সি দেখা যায় বলে খবরের কাগজে এরকম একটা কবিত্বময় হেডিং দেওয়া সম্ভব হোলো রেড রোডের কালো ট্যাক্সি।

চা খেতে খেতে সবাই পূর্ণাংশুর মুখে ঘটনার বিবরণ শুনলো।

দিন পনেরো আগে পার্ক স্ট্রীটের কবরখানার মধ্যে এক ফিরিঙ্গী ছেলে ও আর একটি মেয়ের মৃত দেহ পাওয়া গিয়েছিলো একদিন সকাল বেলা। গলা টিপে মেরে ফেলা হয়েছিলো ওদের দুজনকে। মুখ দেখে মনে হয়েছিলো ওরা যেন ভীষণ ভয় পেয়েছিলো কিছু একটা দেখে। পুলিস খোঁজ করে শুধু এটুকু জানতে পেরেছিলো। যে আগের দিন রাত এগারোটার সময় ওদের রেড রোডে একটি কালো রঙের ট্যাক্সি থামিয়ে তাতে উঠতে দেখা গিয়েছিলো। এর বেশী আর কোনো সূত্র পাওয়া যায় নি।

দিন এগারো আগে রাত দুটোর সময় গ্র্যাণ্ড হোটেল থেকে এক ইউরোপীয়ান ভদ্রলোক পুলিসে ফোন করে জানায় যে সেদিন সন্ধ্যায় তার এক বাঙালী ব্যবসায়ী বন্ধু তার সঙ্গে দেখা করতে আসে। ওরা এক সঙ্গে ডিনার খেয়ে তারপর ময়দানে বেড়াতে যায়। রাত বারোটার কিছু আগে সেই ইউরোপীয়ান আর বাঙালী বন্ধুকে রেড রোডে এক কালো রঙের ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে, নিজে হেঁটে হোটেলে ফিরে আসে। রাত দুটোর একটু আগে বন্ধুর বাড়ি থেকে তার কাছে টেলিফোন আসে। বন্ধুর বাড়ির লোকেরা খুব ব্যস্ত, কারণ সে তখনো বাড়ি ফেরেনি। একথা শুনে সে ব্যস্ত হয়ে পুলিসে খবর দেয় এজন্যে যে রেড রোড অঞ্চল থেকে তার বন্ধুর বাড়ি ট্যাক্সিতে পোনোরো মিনিটের বেশী নয়। পুলিস সে রাত্রিতে বহু খোঁজাখুঁজি করেও কোন সন্ধান পায়নি। কিন্তু পরদিন সকালে সেই বাঙালী ভদ্রলোককে দেখা গেল পার্ক স্ট্রীটের কবরখানায় মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। তার দেহে প্রাণ নেই।

সেদিন থেকে রাত্রিতে রেড রোডে বেশী করে পাহারা দিতে সুরু করলো পুলিসের ভ্যান। একদিন ভ্যানের পুলিস দূর থেকে দেখলো কালো সুট পরা একজন লোক একটি কালো ট্যাক্সি থামিয়ে তাতে উঠছে। পুলিস তাড়াতাড়ি ট্যাক্সির অনুসরণ করলো। কিন্তু সেই ট্যাক্সি অবিশ্বাস্য গতিতে দৃষ্টির অন্তরাল হোলো কয়েক মিনিটের মধ্যেই। ভ্যানের এস-আই তাড়াতাড়ি লালবাজারে খবর দিয়ে ছুটে গেল পার্ক ষ্ট্রীটের কবরখানায়। সেখানে অনেক খোঁজাখুঁজি করে কিছু পাওয়া গেল না। তখন পুলিস সারারাত সজাগ দৃষ্টি রাখলো সে জায়গার উপর। কাউকে দেখা গেলনা সারাবাত। কিন্তু সকাল হতে দেখা গেল একটি মৃতদেহ পড়ে আছে দুটি সমাধির মাঝখানে। সেই কালো সুট পরা লোকটাই।

তারপর থেকে পুলিস ট্যাক্সিকে ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা করলো। পুলিসেব লোক রেড রোডে ঘুরতে লাগলো সাদা পোশাক পরে। আনাচে কানাচে লুকিয়ে রইলো পুলিসেব ভ্যান। একদিন সেই ট্যাক্সিকে পাওয়াও গেল। তাকে থামাতেই আড়াল থেকে পুলিস বেবিয়ে এলো। কিন্তু ধরতে পারলো না। মুহূর্তে স্টার্ট নিয়ে ট্যাক্সি পালিয়ে গেল। তার পেছনে ধাওয়া কবেও তাকে ধরা গেল না।

তবে একজন অফিসার বুদ্ধি কবে নম্বরটা টুকে বেখেছিলো। কিন্তু পরে মিলিয়ে দেখা গেল সেটাও ভুয়ো। কারণ সেটা যে ট্যাক্সির নম্বর সেই ট্যাক্সি বছরখানেক আগে এই বেড বোডেরই এক এ্যাকসিডেণ্টে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। ট্যাক্সি ড্রাইভারও মারা যায় সেই এ্যাকসিডেণ্টে। তাবপর সেই নম্বরের ট্যাক্সির পারমিট আর এ পর্যন্ত ইশু করা হয় নি।

এবকম বহু চেষ্টা করেও ট্যাক্সিটাকে ধরা যাচ্ছে না, পার্কস্ট্রীটের কবরখানায়ও পাহারা রেখে এ ব্যাপারের কোনো কিনারা করা যাচ্ছে না। মাঝখান থেকে একটা চাঞ্চল্য সুরু হয়ে গেছে। পুলিস কর্তৃ-

পক্ষকে বিজ্ঞপ্তি দিতে হয়েছে। কেউ যেন রাত্তিরে রেড রোডে ট্যাক্সি ভাড়া না করে। অন্য দিকে লোকে বলাবলি স্বুরু করেছে একটি ভূতুড়ে ট্যাক্সির গল্প, কোনো যুক্তি সঙ্গত কারণ না পেলে লোক যে রকম অলীক কল্পনার আশ্রয় নিয়ে আত্ম তৃপ্তির চেষ্টা করে, ঠিক তেমনি।

"তাই বলছিলাম," পূর্ণাংশু গুহ বললো, "এরকম একটা রহস্যময় ব্যাপারের অভিজ্ঞতা যদি চান তো রেড রোডে গিয়ে একটি কালো ট্যাক্সি ভাড়া করবার চেষ্টা করুন।"

মহিলারা শিউরে উঠলো।

কান্তি রায়চৌধুরী জিজ্ঞেস করলো, "ব্যাপারটা কি মনে হয়?"

"চট করে যা মনে হয়", অসিত বললো, "সে হচ্ছে, কোনো স্বার্থ সংশ্লিষ্ট লোক এ্যাকসিডেন্ট হওয়া ট্যাক্সিকে উপলক্ষ করে একটা গুজবের আবহাওয়া সৃষ্টি করে তাদের নিজেদের কাজ হাসিল করবার চেষ্টা করছে। এ ছাড়া আর কি হতে পারে?"

"আমাদেরও তাই মনে হয়েছিলো" পূর্ণাশু গুহ বললো, "কিন্তু যে ক'জন লোক পার্কস্ট্রীটের কববখানায় পাওয়া গেছে তাদের পরস্পারের মধ্যে কোনো রকম যোগসূত্র পাওয়া যাচ্ছে না। এমন কোনো কারণও পাওয়া যাচ্ছে না যাতে ওদের মেরে ফেলার পেছনে কারো কোনো গোপন উদ্দেশ্য থাকতে পারে। তারপর এত জায়গা থাকতে পার্কস্ট্রীটের কবরখানায় কেন? ট্যাক্সিতে এত স্পীড কি করে ওঠে যে পুলিসের ভ্যান তাকে ধরতে পারে না? এ সব প্রশ্নের কোনো সদুত্তর পাওয়া যাচ্ছে না।"

"তার মানে এ নয় যে ভুতুড়ে ট্যাক্সির গুজবটা সত্যি", বললো অমরেশ গুপ্ত।

"তা তো বটেই। কিন্তু ট্যাক্সির ড্রাইভারকে যতোক্ষণ হাতেনাতে ধরা যাচ্ছে না ততক্ষণ কিছুই বলা অসম্ভব।"

মঞ্জু বনানীর দিকে ফিরে বললো, "কাল থেকে তোমাদের ময়দানে বেড়াতে যাওয়া বন্ধ।"

বিভূতি বনানী আর অসিতের দিকে ফিরে তাকালো। একটু অন্ধকার হোলো তার মুখ।

মীনা বললো, "আর প্রয়োজন কি? বৈশাখের তো বেশী দেরী নেই।"

ওর কথা শুনে হেসে ফেললো সবাই।

বিভূতি কি যেন ভাবছিলো। হঠাৎ বললো, "এক কাজ করা যাক।"

সবাই বিভূতির দিকে তাকালো।

"অসিত বাবু গিয়ে সেই ট্যাক্সিতে চাপুন। আমি মোটর-বাইকে ট্যাক্সির পিছু নেবো," বিভূতি আস্তে আস্তে বললো।

"বেশ তো। আমি রাজী আছি", অসিত চ্যাটার্জী বললো।

"না, না, তোমায় যেতে হবে না", বলে উঠলো বনানী।

বিভূতি একটু বাঁকা হাসি হাসলো অসিতের দিকে তাকিয়ে। বললো, "আপনাকে যদি কেউ যেতে না দেয়, কি আর করব। আমি অন্য কাউকে খুঁজে নেবো। আমি খবরের কাগজের লোক। সব রকম ঝুঁকি নেওয়া আমার অভ্যেস আছে। আপনি শিগগিরই বিয়ে করবেন। এসব ঝুঁকি নেওয়া আপনার পক্ষে ঠিক হবে না।"

পূর্ণাংশু গুহ হেসে উত্তর দিলো, "ঝুঁকি কাউকে নিতে হবে না। এসব পুলিসের কাজ। ঝুঁকি যা নেওয়ার আমরাই নেবো।"

কথাটা চাপা পড়ে গেল তখনকার মতো। অনেক অন্যান্য কথাবার্তার পর আসর ভাঙলো সেদিনকার মতো।

অসিত গেল সবার শেষে। যাওয়ার আগে ওকে বনানী বললো, "তুমি যা একগুঁয়ে লোক, বিভূতির কথাটা কানে তুলবে না বলে

দিচ্ছি। ওর চোখের চাউনি আমার ভালো লাগেনি, তুমি জানো না, ও একসময় আমায় বিয়ে করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিলো।"

ওর কথা শুনে অসিত হেসে ফেললো। বললো, "তোমার যা বুদ্ধি! আমি তোমায় বিয়ে করছি বলে হিংসে করে ও আমায় ভুতুড়ে ট্যাক্সিতে উঠিয়ে দিয়ে নিজের পথ পরিষ্কার করতে চায়—এই বুঝি তোমার ধারণা? তোমার মাথা খারাপ," বলে বনানীর পিঠ চাপড়ে একটু আদর করে অসিত চলে গেল।

দিন দুয়েক পরের কথা। সেদিন কিসের যেন একটা ছুটি ছিলো। সারা দুপুর দিবানিদ্রার পর অসিতের যখন ঘুম ভাঙলো তখন ছ-টা প্রায় বাজে। এরই মধ্যে ডিসেম্বরের সন্ধ্যা ঘন অন্ধকারে কুয়াশাময় হয়ে উঠেছে। শহরের এ অঞ্চলটা একটু নির্জন। চারদিকে কোনো সাড়াশব্দ নেই। গাছের ডালে ডালে বাসায় ফেরা পাখীরাও স্তব্ধ হয়ে গেছে। দুটো চারটে ঝিঁঝিঁ ডাকছে এদিকে ওদিক, আর কখনো বা দু-একটি গাড়ির দূরাগত হর্ন বহুদূর গড়িয়াহাট রোড থেকে।

হঠাৎ একটু গা ছমছমিয়ে উঠলো। একটু চমকে উঠলো। তারপর হাসলো নিজের মনে। নিজের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করলো একটুখানি। সারা দুপুর ঘুমিয়েছে আজ, ঘুমোনোর আগে কিছুক্ষণ এডগার এ্যালেন পো-র গল্প পড়েছে, তারপর ঘুমিয়েছে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেছে, শহরের একটি বিখ্যাত প্রেক্ষাগৃহে একদল মণিপুরী নাচ নাচছে। তারপর ঘুম ভেঙে উঠে এখনো শুধু একটি গেঞ্জি গায়ে বসে আছে। আর আজ যেন ঠাণ্ডা পড়ে গেছে একটুখানি। তার গা শিরশির করে উঠেছে, এবং মনের ঘুম-জড়িমায় মিশে গিয়ে এই শিউরে-ওঠা তার অবচেতনায় উঠে গেছে গা-ছমছমানোর পর্যায়ে।

অসিত হাসলো। তারপর ভাবলো, কিন্তু আজ হঠাৎ এডগার এলেন পোর ভূতুড়ে গল্প কেন পড়তে গেলাম। ভাবলো, ভাবলো, তারপর মনে পড়লো।

বিভূতি এসেছিলো সকালবেলা। এসে বললে, "আমি আজ রাত্তিরেই বেরোচ্ছি রেড রোডের কালো ট্যাক্সির ব্যাপারটার হদিশ করবার জন্যে। আপনি যাবেন নাকি আমার সঙ্গে?"

সে যে-দৃষ্টিতে তাকালো অসিতের গা জ্বলে গেল। সে রাজী হয়ে গেল কোনোরকম অনিচ্ছা না দেখিয়ে।

কোথায় কখন দেখা হবে সেকথা অসিতকে বুঝিয়ে দিয়ে বিভূতি চলে গেল।

বিভূতি চলে যাওয়ার পর অসিত ভাবতে লাগলো,—রাজী হয়ে কি ভালো করলাম? রোড রোডের কালো ট্যাক্সির ব্যাপারটা জেনে আমার কি লাভ। বিভূতি খবরের কাগজের লোক। এই ব্যাপারে তার উৎসাহ থাকতে পারে। কিন্তু আমার কি? কে জানে কোন গুণ্ডা বদমাইশের পাল্লায় পড়বো। অনর্থক ঝামেলা!

দুপুরে ঘুমুতে যাওয়ার আগে রীতিমতো অসোয়াস্তি লাগছিলো। কি বই পড়া যায় ভাবতে ভাবতে হাতের কাছে পেয়ে গেল এডগার এ্যালেন পো-র বই। তাই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়লো।

সন্ধ্যেবেলা বনানী এসে উপস্থিত হোলো। বললো, "তুমি আজ বিভূতির সঙ্গে যাচ্ছো?"

"হ্যাঁ। তুমি কি করে জানলে," অসিত অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

"বিভূতি টেলিফোন করেছিলো। তুমি যেয়ো না।"

"কেন?" একটু হেসে অসিত জিজ্ঞেস করলো।

"আমার ভয় করছে," বনানী উত্তর দিলো, "বিভূতি লোক ভালো নয়। ও হয়তো চাইছে যে তুমি কোনো রকম বিপদে পড়ো।"

অসিত আস্তে আস্তে চললো, "সে চাইলেই যে আমি বিপদে পড়বো, এটা সম্ভব নয়। একথা প্রমাণ করবার জন্যেই আমি যাবো। তুমি ভেবো না। আমার কিচ্ছু হবে না।"

বনানীকে নিয়ে অসিত ছ-টার শোতে একটি সিনেমায় গেল। সিনেমার পর চৌরঙ্গির একটি রেস্তরাঁয় খাওয়া-দাওয়া করে ওকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে অসিত চলে এলো রেড রোডের নির্দিষ্ট জায়গায়। বনানীর মানা শুনলো না।

তখন রাত সাড়ে দশটা। বেশ ঠাণ্ডা। কনকনে উত্তরী হাওয়ায় কেঁপে কেঁপে উঠছে গাছের পাতাগুলো। কৃষ্ণপক্ষের একফালি চাঁদের ক্ষীণ আলোয় অন্ধকার আরো বিভীষিকাময় হয়ে উঠেছে ছায়ায় আবছায়ায় মিশে। এত অন্ধকার যে উড়ন্ত বাদুড়গুলোও দেখা যায় না, শুধু অনুভব করা যায়।

ওরা দাঁড়িয়ে ছিলো পথের এক পাশে। কাছেই একটি গাছের ছায়ার অন্ধকারে দাঁড় করানো ছিলো বিভূতির হার্লি-ডেভিডসন মোটর সাইকেল।

ওরা চুপচাপ অপেক্ষা করলো। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলো। ডাইনে বাঁয়ে অন্ধকারে যতদূর চোখ যায় রেড-রোড একেবারে ফাঁকা। গাড়ির চলাচল থেমে গেছে অনেকক্ষণ।

এক সময় বিভূতি বলে উঠলো, "ওটা কি? একটা গাড়ির আলো না? হ্যাঁ, একটি কালো ট্যাক্সি। আচ্ছা, অসিতবাবু—।"

অনিশ্চিতের মুখোমুখি এসে আশঙ্কার দুর্বলতা ঘুচে গেল দু-জনেরই। স্নায়ু সবল হয়ে উঠলো।

"এই ট্যাক্সি—রোখকে!"

একটি কালো ট্যাক্সি ব্রেক কষে থেমে গেল। ট্যাক্সি চালাচ্ছিলো যে লোকটি, তার গায়ে পুরু সোয়েটার, গলায় মাফলার জড়ানো, কান

ঢাকার আড়াল থেকে শুধু চোখ দুটো বেরিয়ে আছে। অসিতের মনে হোলো হঠাৎ যেন ভীষণ ঠাণ্ডা পড়ে গেছে। তার গায়ে পুরু পুলওভার, টুইডের কোট, পরণে ফ্লানেলের প্যাণ্ট। তবু মনে হোলো যেন খালি গায়ে দাঁড়িয়ে আছে বাইরের ঠাণ্ডায়। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ট্যাক্সির ভেতরটা নিরীক্ষণ কবল সে। ফাঁকা ট্যাক্সি। একেবারে ফাকা।

ট্যাক্সির ড্রাইভার কোনো কথা না বলে হাত বাড়িয়ে পেছনের দরজাটা খুলে দিলো। অসিত গাড়িতে উঠে বিভূতিকে বললো, "আচ্ছা, বিভূতিবাবু। কাল দেখা হবে—।"

ট্যাক্সি ছেড়ে দিলো।

তিন চারটি দ্রুত পদক্ষেপে বিভূতি চলে গেলো সেই গাছের নিচে, যেখানে ঘন অন্ধকার ছায়ায় দাঁড় করানো ছিলো তাব মোটর সাইকেল। এক নিমেষে স্টার্ট নিলো সেটি। বিভূতি যখন কালো ট্যাক্সির পিছু ধাওয়া সুরু করলো, ততক্ষণে বড় জোর পোনেরো বিশ সেকেণ্ড কেটে গেছে।

ট্যাক্সিব পেছনের লাল আলোর উপর চোখ রেখে গীয়ার পাল্টে গতি বাড়িয়ে দিলো বিভূতি। কোথায় যাচ্ছে সেদিকে নজর রাখতে পারলো না। যেমন করেই হোক ট্যাক্সিকে চোখের আড়াল করলে চলবে না। তার চোখের সামনে থেকে সব কিছু মুছে নিলো নিকষ কালো অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মাঝখানে শুধু একটি লাল আলোর চিহ্ন। মোটরবাইকের গতি সে আরো বাড়িয়ে দিলো। লাল আলোটার কাছাকাছি হতে লাগলো ক্রমশ। নিজের মোটর-বাইকের আওয়াজটুকু ছাড়া আর কোনো শব্দই কানে এলো না। রাত্তিরের কনকনে হাওয়া একটানা শীস দিয়ে চললো কানের পাশ দিয়ে। মুখখানি বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে এলো। কিন্তু ঘামে ভিজে গেল শরীরের ভেতরটা, অমন ঠাণ্ডা ডিসেম্বরের রাত্তিরেও। অসম্ভব গতিতে ছুটে চলেছে মোটর বাইক, এত তীব্র গতিতে সে আর মোটরবাইক চালায়নি কোনোদিন। যদি একটু এদিক

হয় তাহলে আর কিছু থাকবে না তার শরীরের এবং মোটর-বাইকের। কিন্তু সে সব কথা ভাববার সময় নেই। লাল আলোটা ক্ষীণ হয়ে আসছে। মোটরবাইকের গতি আরো বাড়িয়ে দিলো বিভূতি। লাল আলোটা আরো নিকটস্থ হয়ে এলো। কমে এলো তাদের ব্যবধান। দু তিনশো গজের বেশী হবে না। বিভূতি অন্ধকারের ভিতর দিয়ে দেখবার চেষ্টা করলো। কিন্তু কোথাও কিছু দেখা গেল না। চারিদিকে জমাট কালো অন্ধকার,—তার মাঝখানে সামনের ট্যাক্সির পেছনদিকের লাল আলো একটি ছোট্টো চাকতির মতো। সেই লাল আলোর চাকতি আস্তে আস্তে আয়তনে বাড়তে লাগলো। বড়ো, ক্রমশ আরো বড়ো, লাল আলোর একটি চোখ ঝলসানো গোলক, চারদিকে শুধু টকটকে লাল আগুনের মতো অন্ধকার, বরফের মতো ঠাণ্ডা কনকনে আগুন।—তারপর হঠাৎ নিভে গেল সমস্ত লালিমা, একটা সবুজ চোখ-ধাঁধানো বিভ্রান্তির মধ্যে দিয়ে অন্ধকার ফিরে এলো, আরো কালো, আরও নিকষ কালো, আলকাতরার মতো জমাট কালো অন্ধকার। গাছের পাতায় ঝিরঝির করতে লাগলো কনকনে উত্তরী হাওয়া। চারিদিকে কোথাও কোনো কালো ট্যাক্সির পেছনদিকের লাল আলোর চিহ্নমাত্রও রইলো না।

ঘণ্টাখানেক পরে এসিস্ট্যান্ট কমিশনার পূর্ণাংশু গুহর টেলিফোন বেজে উঠলো।

"হালো—?"

"হালো, আমি অসিত চ্যাটার্জী কথা বলছি।"

"কে? অসিত বাবু? আমি ঘণ্টাখানেক ধরে আপনাদের খোঁজাখুঁজি করছি। বনানী আমায় ফোন করে জানিয়েছিলো যে আপনি আর বিভূতিবাবু রেড রোডে ট্যাক্সি ধরতে গেছেন। সত্যি, আমায় কী

দুর্ভাবনায় ফেলেছিলেন বলুন তো? তখনই মানা করেছিলাম! কোত্থেকে কথা বলছেন?"

"রসা রোডের উপর এক পেট্রল পাম্প থেকে—।"

"ওখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন কি করে?"

"শুনুন না, বলছি। আমি ট্যাক্সিটা ঠিকই ধরেছিলাম। ট্যাক্সির ড্রাইভারকে বললাম, লেকের দিকে চলো। সে আমায় লেকে নিয়ে গেল। লেকের চারদিকে অনেকক্ষণ ঘুরলাম। তারপর টালিগঞ্জ হয়ে রিজেন্ট পার্কের ওদিক থেকে ঘুরে গড়িয়া যাদবপুর হয়ে আবার লেকে ফিরে এলাম। ওকে বললাম, আমায় এসপ্লানেডে নিয়ে চলো। ঘড়িতে তখন সাড়ে বারোটা। সে রাজী হোলো, বললো, তাকে গ্যাবাজে ফিরতে হবে। আমায় টালিগঞ্জ ব্রিজের কাছে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। খুব নিরীহ মনে হোলো লোকটাকে।"

"নিশ্চয়ই কোনো ভুল ট্যাক্সিতে চেপেছিলেন—বিভূতিবাবু কোথায়?"

"জানি না। ট্যাক্সি এত জোরে চালিয়েছিলো যে বিভূতিবাবু কিছুতেই সঙ্গে সঙ্গে আসতে পারলো না। ওর কাছ থেকে কোনো খবর পান নি? সে কি কথা?"

পূর্ণাংশু গুহ রসা রোডে এসে অসিতকে তুলে নিলো। তারপর গেল বিভূতির বাড়ীতে। শুনলো, সে ফেরেনি। তখন গেল বিভূতিদের খবরের কাগজের অফিসে। শুনলো, সেখানেও যায় নি সে। তখন অসিতকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে লালবাজারে চলে গেল পূর্ণাংশু গুহ।

বিকেল বেলা অসিত এলো বনানীর বাড়ি। দেখলো বনানী বিষণ্ণ হয়ে বসে আছে।

"শুনেছো তাহলে?" অসিত আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো।

বনানী ঘাড় নাড়লো। বললো, "পূর্ণাশুবাবু এসেছিলেন কিছুক্ষণ আগে।"

বিভূতিকে পাওয়া গিয়েছিলো সকাল বেলা। পার্ক স্ট্রিটের কবরখানায় পাঁচিলের ওপাশে দুটি কবরের মাঝখানে উপুড় হয়ে পড়েছিলো। এক পাশে পড়েছিলো চূর্ণ-বিচূর্ণ মোটর সাইকেল খানি। পুরোনো কবরখানার জীর্ণ পাঁচিলের যে জায়গায় দুরন্ত গতিতে ধাক্কা মেরে দেওয়াল ধ্বসিয়ে বিভূতির মোটর বাইক ভেতরে ঢুকে পড়েছিলো সেখানকাব পুরোনো ভাঙা ইঁটগুলি ছড়িয়ে পড়েছিলো ফুটপাথের উপর।

বনানী বললো আস্তে আস্তে, খুব ধরা গলায়, "অসিত, আমার কি মনে হচ্ছে জানো? কালো ট্যাক্সির পিছু ধাওয়া করা, সে একটা ছুতো। ওটা কিছু নয়। ও ইচ্ছে করেই এ্যাকসিডেণ্ট করে মরেছে। ও আমায় খুব ভালবাসতো। ও যে আমায় বিয়ে করতে পারলো না এতে ওর খুব মনে লেগেছিলো।"

অসিত বনানীর কথার কোনো উত্তর দিলো না। ওর হাতখানি টেনে নিলো নিজের হাতের মধ্যে।

বনানী জানলো না যে, অসিত ট্যাক্সির নম্বরটা টুকে রেখেছিলো। সেটা ছিলো সেই ট্যাক্সি, যার খোঁজ করছিলো কলকাতার পুলিস, যেই নম্বরের কোনো ট্যাক্সিই নেই কলকাতায়।

আর জানলো না যে, পার্ক ষ্ট্রীটের কারখানার আশেপাশে কোথাও কেউ কোনো এ্যাকসিডেণ্টের আওয়াজ শুনতে পায়নি। একটি কুকুরও ডেকে ওঠেনি কোথাও। সারারাত ছিলো কলকাতার ডিসেম্বরের অন্যান্য কনকনে রাত্রিরের মতো নিস্তব্ধ, নিঝুম।